কাকাবাবু সমগ্র

জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. সন্তুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা 2
২. অমল আর মঞ্জু 14
৩. হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন 30
৪. প্লেনটা বেশ ছোট 44
৫. মাসাইমারার রাত্তির 61
৬. সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে 72
৭. গণ্ডারটা দাঁড়িয়ে আছে 95
৮. মাসাইদের পুরো গ্রাম 112

১. সন্তুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা

সন্তুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, এই, তুই ঘুমোচ্ছিস? দ্যাখ, দ্যাখ, আমরা এসে গেছি।

সন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে একটুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাক খেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনেই পড়ল না, সে কোথায় রয়েছে। সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল, একটা স্বপ্ন দেখছিল। সে যেন ফিরে গেছে আন্দামানে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছে একটা মোটর-বোটে, দু পাশে গাঢ় নীল জল, মাঝে-মাঝে ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে উঠছে চড়াইপাখির মতন। উড়ুক্কু মাছ-পাশেই একটা বড় দ্বীপ, ঘন জঙ্গলে ভরা, মোটর-বোটের আওয়াজ শুনে সেই জঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল জারোয়ারা, হাতে তাদের তীরধনুক…তারা সন্তুকে চিনতে পেরেছে, শুধু তাই নয়, তারা বাংলাও শিখে গেছে, তারা সবাই মিলে হাত তুলে ডাকছে, সন্তু, এসো, এসো, কোনও ভয় নেই, এখানে এসো…

দু হাতে চোখ ঘষে ভাল করে তাকিয়ে সন্তু আবার দেখল, কোথায় আন্দামানের সমুদ্র? সে বসে আছে একটা প্লেনে, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। পাশের সিটে বসে আছেন কাকাবাবু, তিনি কী যেন বলছেন, সন্তু ভাল শুনতে পাচ্ছে না।

কাকাবাবু এত কাছ থেকে কথা বলছেন, তবু সন্তু বুঝতে পারছে না কেন? প্লেন চলার শব্দও তার কানে আসছে না। তার কানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেকখানি বাতাস।

কাকাবাবু তার অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেসে বুকে এসে সন্তুর নাকটা চেপে ধরলেন, তারপর তার মাথায় মারলেন একটা চাপড়। তাতে ভুস করে তার কান থেকে যেন খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে গেল, অমনি সে শুনতে পেল প্লেনের গর্জন।

কাকাবাবু বললেন, সিট-বেল্ট বেঁধে নে। একটু বাদেই আমরা পৌঁছে যাব।

এতক্ষণে সন্তুর সব মনে পড়ে গেছে। সিট-বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে সে ঝুঁকে পড়ল জানলার কাচের ওপর। ইশ, কতটা সময় সে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে কে জানে! কিন্তু একটা সময় কিছুই দেখার ছিল না, শুধু মেঘ। আর মেঘ, ধপধপে সাদা দুধ-সমুদ্রের মতন মেঘ। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন আপনাআপনি চোখ বুজে এসেছে।

প্লেনটা বিমানবন্দরের ওপর দিয়ে ঘুরছে, গতি কমে এসেছে, এক্ষুনি ল্যান্ড করবে। সন্তু আনন্দমেলায় একটা লেখাতে পড়েছিল যে, একবার এই নাইরোবি এয়ারপোর্টেই দুটো সিংহ এসে ঢুকে বসে ছিল। তা হলে কাছেই নিশ্চয়ই ঘন জঙ্গল আছে। কিন্তু সন্তু জানলা দিয়ে কোনও জঙ্গল দেখতে পেল না, শহরের উঁচু-উঁচু বাড়ি, আর শহরের বাইরে বিশাল ধু-ধু করা মাঠ চোখে পড়ে, তার মধ্যে-মধ্যে ছোটখাটো ঝোপঝাড়। তা হলে এখানে সিংহ এসেছিল। কোথা থেকে?

প্লেন যখন আকাশ দিয়ে চারশে-পাঁচশো মাইল স্পিড়ে যায়। তখন গতিবেগটা কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু নামবার সময় যখন স্পিড অনেক কমে আসে তখন মনে হয় কী প্রচণ্ড জোরে ছুটছে! মাটিতে নামার পর এক মিনিটে অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ প্লেনটা শান্তশিষ্ট হয়ে যায়।

সিট-বেল্ট খুলে সবাই যখন নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন কাকাবাবু বললেন, তোর হ্যান্ডব্যাগ থেকে সোয়েটারটা বার করে নে, সন্তু। বাইরে বেরোলে শীত করবে।

আফ্রিকার নাম শুনলেই মনে হয় খুব গরম দেশ। তা ছাড়া এখন মে মাস। কিন্তু কাকাবাবু আগেই বলে রেখেছিলেন যে, কেনিয়া দেশটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মকালেও একটু বৃষ্টি হবার পরেই শীত করে।

সন্তুরা প্লেনে চেপেছে বম্বে থেকে। সেখানে অসহ্য গরম। মা যদিও সন্তুর সুটকেসে নতুন-বানানো একজোড়া প্যান্ট-কোট ভরে দিয়েছেন, কিন্তু বম্বেতে সেসব পরার প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর ধারণা ছিল, প্লেনে সবাই খুব সাজগোজ করে ওঠে, কিন্তু এই প্লেনে বিদেশিরা প্রায় সবাই পাতলা শার্ট গায়ে দিয়ে আছে, কেউ-কেউ পরে আছে স্রেফ গেঞ্জি। ভারতীয়রা

যদিও অনেকেই বম্বে এয়ারপোর্টে সুন্ট-টাই পরে ঘেমেছে। কাকাবাবুর কথায় সন্তু অবশ্য এমনি প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছে। একটা সোয়েটার রেখেছে সঙ্গের হ্যান্ডব্যাগে।

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্য সবাই না নেমে গেলে তাঁর পক্ষে যাওয়ার অসুবিধে। পেছন থেকে একজন যাত্রী এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি যান। আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন।

কাকাবাবু আপত্তি করার আগেই লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটি তুলে নিয়ে অন্য যাত্রীদের আটকে রাখল। এই সব অযাচিত সাহায্য কাকাবাবু পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন কথা বাড়াতে গেলে অন্যদের আরও দেরি হয়ে যাবে। তিনি চুল্লিতে শুরু করলেন।

সন্তু লক্ষ করল, লোকটির নিজের ব্যাগ আর কাকাবাবুর ব্যাগটা অবিকল একরকম। দুটোই কালো রঙের, একই সাইজের। কাকাবাবুর ব্যাগে অবশ্য তাঁর নাম লেখা আছে। তবু সন্তুর সন্দেহ হল, লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটা বদলে নেবে না তো? লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটা বাঁ হাতে নিয়েছে, সে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। সেদিকে।

লোকটি বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, মাঝারি বয়েসি, একটা চকলেট রঙের সুট পরা। মাথার চুল এত বড় যে, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে।

প্লেন থেকে নেমে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।

লোকটি বলল, আমাকে আপনি চিনবেন কী করে? তবে আপনাকে আমি চিনি। আমার নাম লোহিয়া, পি. আর. লোহিয়া, আমি এখানে ব্যবসা করি। আপনি বিশেষ কোনও কাজে এসেছেন নিশ্চয়ই?

কাকাবাবু বললেন, না, এমনিই বেড়াতে এসেছি।

লোকটি বলল, বেড়াবার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা। তবে, আপনার মতন ব্যস্ত লোক তো কোথাও এমনি-এমনি বেড়াতে যায় না। আশা করি ওয়েদার ভাল পাবেন।

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বলল, নাউ, ইউ হোল্ড দ্য ব্যাগ।। আই মাস্ট হারি।

কাকাবাবু বললেন, ধন্যবাদ।

লোকটি বলল, হয়তো আবার দেখা হয়ে যাবে। ছোট জায়গা তো!

সন্তুর হাতে ব্যাগটা দিয়ে সে হনহন করে এগিয়ে ভিড়ে মিলে গেল।

সন্তু ব্যাগটা ভাল করে দেখল। কাকাবাবুর নাম লেখা আছে ঠিকই। নাঃ, শুধু শুধু সব লোককে সন্দেহ করা তার একটা বাতিক হয়ে যাচ্ছে। লোকটি ভদ্র এবং পরোপকারী।

কাস্টমস, চেকিং পার হতেই সন্তু দেখতে পেল দুজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা ওদেরই দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। তাদের একজনকেও সন্তু চেনে না। কাকাবাবুর মুখে সে শুনেছিল যে, এয়ারপোর্টে একজন লোক তাদের নিতে আসবে, সেই লোকটি কাকাবাবুর নাম লেখা একটা বোর্ড উঁচু করে ধরে থাকবে। সেইরকম অনেকেই নানান নাম লেখা বোর্ড হাতে তুলে আছে কিন্তু এই তিনজনের কাছে সে-রকম কিছু নেই।

গেটের কাছ থেকেই একজন জোরে বলে উঠল, কাকাবাবু, সন্তু, ওয়েলকাম টু নাইরোবি?

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ব্যাপার বল তো! আজিকাল বড় বেশি লোক আমাকে চিনে ফেলেছে! এখানে আমাকে কেউ কাকাবাবু বলে ডাকবে, ভাবতেই পারিনি!

সেই যুবকটি সন্তু আর কাকাবাবু দুজনেরই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে বাংলায় বলল, আমাকে দিন। আমার নাম অমল, আর ওই যে আমার স্ত্রী মঞ্জু। আর ইনি মিঃ ধীরুভাই, ইনি আপনার এখানকার হোস্ট। ধীরুভাই আমাদের প্রতিবেশী, ওঁর মুখে যখন শুনলুম যে, আপনারা আসছেন, তখন আর এয়ারপোর্টে আসার লোভ সামলাতে পারলুম না। এখানে বাঙালি তো বিশেষ আসে না।

ধীরুভাই বেশ বয়স্ক মানুষ, মাথার চুল কাঁচাপাকা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। প্যান্ট-শার্টের ওপর একটা জহরকোট পরে আছেন। তিনি কাকাবাবুর দিকে প্রথমে হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর আবার কাকাবাবুর একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, প্লেন একেবারে রাইট টাইমে এসেছে। আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি নিশ্চয়ই?

কাকাবাবু বললেন, কিছুমাত্র না।

বাইরে ওদের সঙ্গে দুখানা গাড়ি রয়েছে। দুটোই জাপানি গাড়ি। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, আকাশে এক ছিটে মেঘ নেই, একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, এখানে একটুও গরম নেই দেখছি।

অমল বলল, আপনাদের জন্য চমৎকার ওয়েদার ফিট করে রেখেছি, যাতে আপনাদের একটুও অসুবিধে না হয়।

গোলাপি রঙের শাড়ি পরা মঞ্জু বলল, আপনাদের জন্য তো হোটেল ঠিক করা আছে, কিন্তু আপনারা আমাদের বাড়িতে থাকবেন? তা হলে আমরা খুব খুশি হব। আমরা আপনাদের ডাল-ভাত-মাছের ঝোল খাওয়াতে পারব, হোটেলে সেসব পাবেন না।

ব্লু জিনস আর হলদে গেঞ্জি পরা অমল বলল, আপনারা এসেছেন, আমি অফিস থেকে ছুটি নেব। যেখানে যেতে চাইবেন আমি গাইড হয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, এঁরা যখন আমাকে নিয়ে এসেছেন, তখন আগে এঁদের হোটেলেই উঠি। পরে একসময় আপনাদের বাড়ি যাওয়া যাবে।

অমল দু হাত নেড়ে বলল, ওসব আপনি-টাপনি চলবে না। আমাদের তুমি বলবেন।

মঞ্জু বলল, আমরা দুজনেই আপনার খুব ভক্ত।

অমল তার স্ত্রীকে বলল, মঞ্জু, তুমি ক্যামেরা আনোনি? তা হলে সন্তু আর কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা ছবি তুলে রাখতুম।

মঞ্জু বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন, পরে ছবি তোলবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে...

অমল সন্তুর কাঁধে হাত রেখে বলল, কাকাবাবু তো হোটেলে যেতে চাইছেন। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? চলো না, অনেক গল্প শুনব তোমার কাছে।

সন্তু বলল, আমিও পরে যাব।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাকাবাবু আর সন্তু উঠে পড়ল। ধীরুভাইয়ের গাড়িতে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমল আবার সন্তুকে বলল, হোটেলে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, আমরা একটু পরে আসছি। তারপর বেড়াতে বেরোব। আজই তোমাকে সিংহ দেখাব।

নতুন দেশে এলে গলাটা কেমন শুকনো-শুকনো লাগে। অমল আর মজুর আপনি-আপন ভাব আর বাংলা কথা শুনে ভাল লাগল তবু কিছুটা।

এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে, অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এসে ঢুকাল নাইরোবি শহরে। বেশ চওড়া-চওড়া রাস্তা, পরিচ্ছন্ন আর উঁচু-উঁচু বাড়ি। সন্তুর মনে হল, সিনেমায় দেখা বিলিতি-বিলিতি শহরের মতন অনেকটা। রাস্তায় আলো, মানুষজন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অনেক ভারতীয়, শাড়ি-পরা মহিলাদের দূর থেকেই চেনা যায়, আবার বেশ কিছু সাহেব-মেমও রয়েছে।

গাড়ি এসে থামল হিলটন হোটেলের সামনে। গাড়ি চালাচ্ছিল একজন সাদা পোশাক পরা ড্রাইভার, সে তাড়াতাড়ি আগে নেমে দরজা খুলে দিল কাকাবাবুদের জন্য।

ধীরুভাই বললেন, এই হোটেলে আমাদের একটা সুইট নেওয়া আছে পাকাপাকিভাবে। আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টাররা এসে থাকেন। তা ছাড়া সারা বছরই কোনও না কোনও অতিথি আসে। পাঁচ নম্বর ফ্লোরে পাঁচ নম্বর সুইট। আপনাদের আশা করি কোনও অসুবিধে হবে না। হোটেলে কোনও কিছুর জন্যই আপনারা পয়সা খরচ করবেন না। এমনকী ট্যাক্সি বা সিনেমার টিকিট চাইলেও হোটেল থেকে ব্যবস্থা করে দেবে। আপনারা শুধু বিলে সই করবেন। তা ছাড়া, আমি তো আছিই। যে-কোনও সময় দরকার হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

একটি বেলবয় এসে ওদের সুটকেস দুটো তুলে নিতেই ধীরুভাই তাকে বললেন, ফাইভ জিরো ফাইভ।

বেলবয়টি মাথা নেড়ে একগাল হেসে বলল, আই নো, আই নো?

ভেতরে কাউন্টারে এসে খানিকটা কথা বলে ধীরুভাই বিদায় নিলেন। কাকাবাবু আর সন্তু লিফটে উঠে এল পাঁচ তলায়।

হোটেলের ঘর আর সুইটের মধ্যে যে কী তফাত তা সন্তু জানত না। ঘর তো হচ্ছে এমনিই একটা শোবার ঘর, আর সুইট মানে হল, দরজা খুলে ঢোকার পর জুতোটুতো রাখার একটুখানি জায়গা, তারপর বসবার ঘর একটা, তাদের শোবার ঘর, পোশাক পালটাবার জন্য আর-একটা ছোট ঘর। বিরাট বাথরুম, বারান্দা সব মিলিয়ে যেন নিজস্ব একটা ফ্ল্যাটের মতন। টিভি, ফ্রিজ, কিছু ফল, কোল্ড ড্রিঙ্কস সবই সাজানো রয়েছে।

বেলবয়টি ওদের সুটকেস দুটো এনে গুছিয়ে রেখে, জানলার পর্দাগুলো খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কিছু চাই স্যার?

ছেলেটি প্রায় সন্তুরই বয়েসি। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো, দাঁতগুলো ধপধপে সাদা। তার মুখখানা হাসি-হাসি, দেখতে বেশ ভাল লাগে।

সন্তু তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

সে দু-তিনবার নাম বললেও সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। তারপর সে বানান করে বললে, মাইকেল।

কোথায় কবি মাইকেল আর কোথায় আফ্রিকার এক হোটেলের বেলবয়। দুজনের একই নাম। সন্তু অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, এখানে অনেকেই ক্রিশচান। আর ক্রিশচীনদের মধ্যে মাইকেল নাম খুব কমন। আজকাল শুধু মাইক বলে। ও প্রথমে ওর ডাকনামটাই বলছিল।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, ইয়েস, ইয়েস, মাইক, মাইক?

কাকাবাবু বললেন, না মাইক, এখন কিছু লাগবে না। দরকার হলে ডাকব।

সে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, টিপস, স্যার!

কাকাবাবু বললেন, আমার কাছে তোমাদের শিলিং নেই। পরে দেব।

মাইক তবু বলল, গিভূমি পাউন্ড, ডলার। নো ইন্ডিয়ান রুপিজ!

কাকাবাবু তাকে একটি ব্রিটিশ পাউন্ড দিলেন, সে থ্যাং ইউ স্যার বলে চলে গেল।।

কাকাবাবু বললেন, চালু ছেলে! এখানকার টাকা হল শিলিং, বুঝলি, আমাদের কিছু টাকা ভাঙিয়ে শিলিং করে রাখতে হবে, নইলে ঠকাবে।

সন্তু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, খুব সুন্দর জায়গা। আমি ভেবেছিলুম, জঙ্গল-টঙ্গলের মধ্যে ছোটখাটো একটা শহর হবে।

কাকাবাবু বললেন, জঙ্গল আবার পাচ্ছিস কোথায়? এখানে সেরকম জঙ্গল তো নেই।

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে জঙ্গল নেই? তবে যে এখানে অনেক সিংহ আর অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে শুনেছি।

কাকাবাবু বললেন, সিংহ তো জঙ্গলে থাকে না। সিংহ থাকে। মরুভূমিতে কিংবা শুকনো জায়গায়, যেখানে কিছু ঘাস-টাস জন্মায়, যেখানকার মাটির রং সিংহের গায়ের মতন।

সন্তু তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, অনেক গল্পের বইটইতে ছবি আঁকা থাকে বটে যে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সিংহ হঠাৎ লাফিয়ে এসে মানুষকে আক্রমণ করছে? আসলে সিংহ ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভালবাসে, আর চট করে মানুষকে আক্রমণও করে না। এখানে এসেছিস যখন, তখন তুই নিজের চোখেই সিংহ দেখতে পাবি, খুব কাছে গিয়ে দেখবি।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে কাকাবাবু বললেন, যাই, স্নানটা সেরে নিই।

সন্তু তুই আগে যাবি নাকি?

সন্তু বলল, না, তুমি করে নাও!

বাথরুমের ভেতরটা একবার উঁকি মেরে আবার বেরিয়ে এসে কাকাবাবু বললেন, কী দারুণ জায়গায় আমাদের রেখেছে রে, সন্তু। এত ভাল হোটেলে আমরা আগে কখনও থেকেছি?

সন্তু হাসি মুখে দুদিকে মাথা নাড়ল।

আমরা এখানে বেশিদিন থাকব না, আর-একটা জায়গায় চলে যাব। সে-জায়গাটা নাকি আরও সুন্দর। ভুলাভাই তো সেই কথাই বলেছে। সেখানে তুই খানিকটা জঙ্গল পেতে পারিস। এবারে ডাকাত-গুণ্ডাদের পেছনে ছোটাছুটি করতে হবে না। কোনও রহস্যের সমাধান করতে হবে না। স্রেফ বেড়ানো আর বিশ্রাম। তোর খিদে পেয়েছে নাকি রে, সন্তু?

না, প্লেনে তো অনেক খাবার দিয়েছিল।

আমি প্লেনের খাবার একদম খেতে পারি না। দাঁড়া, স্নান-টান করে নিই, তারপর বেরিয়ে দেখব, এখানে কী কী নতুন খাবার পাওয়া যায়। জেব্রার মাংসের রোস্ট, ফ্লেমিংগোর কাটলেট, জিরাফের ঝোল, এইসব চেখে দেখতে হবে।

কাকাবাবু বাথরুমের দরজা বন্ধ করার পর সন্তু জানলার একটা কাচ খোলার চেষ্টা করতে লাগল। এয়ারকন্ডিশান্ড ঘর, এখানে বোধহয় কেউ জানিলা খোলে না, তাই জানলাটা একেবারে টাইট হয়ে আটকে আছে। কিন্তু টাটকা হাওয়ায় নিশ্বাস না নিলে সন্তুর ভাল লাগে না।

জানলাটা খুলতে না পেরে সে বারান্দার দরজাটা খুলতে গেল। তক্ষুনি ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

এখানকার টেলিফোনটাও অন্যরকম দেখতে। ঘন দুধের সরের মতন রং। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি নাকি? রিসিভারটা বেশ ভারী।

রিসিভারটা তুলতেই চিবোনো-চিবোনো ইংরেজিতে খুব সরু গলায় একজন বলল, রায়চৌড্রি? রায়চৌড্রি? ইজ দ্যাট র্যাজা রায়চৌড্রি?

সন্তু বলল, রাজা রায়চৌধুরী বাথরুমে গেছেন। আপনি কে বলছেন?

কল হিম। কল হিম! দিস ইজ ভেরি ইম্পেটন্ট!

আপনি কে বলছেন?

ড্যাম ইট! কল র্যাজা রায়চৌড্রি!

সন্তু ভাবল রিসিভারটা রেখে দেবে। কোনও পাগল-টাগল নিশ্চয়ই। বিশেষ দরকার না হলে কাকাবাবু বাথরুমে ডাকাডাকি করা পছন্দ করেন না। এখানে সেরকম বিশেষ দরকার কী হতে পারে? তা ছাড়া লাকটা এরকম বিশ্রীভাবে কথা বলছে কেন?

সন্তু বলল, আপনি কে এবং কী দরকার আগে বলুন। নইলে মিঃ রায়চৌধুরীকে এখন ডাকা যাবে না।

তুমি কে? রায়চৌড্রির বেঁটে ভাইপোটা বুঝি?

এবার সন্তুর রাগ হয়ে গেল। সে বেঁটে? এখনই তার হাইট পাঁচ সাড়ে পাঁচ, তার ক্লাসের কেউ তার চেয়ে বেশি লম্বা নয়, আর একটা কোথাকার পাগল তাকে বললে বেঁটে?

সন্তু ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিল, তক্ষুনি অন্য একটা গলা শোনা গেল। এই গলার আওয়াজটা গভীর। আগের পাগলাটিকে একটা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই গম্ভীর গলার লোকটি বলল, রাজা রায়চৌধুরী বাথরুমে? তা হলে শোনো, তাকে এক্ষুনি একটা জরুরি খবর দিয়ে দিতে হবে। কাল সকালেই বম্বের একটা ফ্লাইট আছে, তাতে চার-পাঁচটা সিট এখনও খালি আছে। তুমি এবং তোমার আংকল কাল সকালেই সেই প্লেনে চলে যাবে। এখান থেকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কেন, আমাদের কালই চলে যেতে হবে কেন?

কারণ, এই দেশটা তোমাদের পক্ষে সেইফ নয়। রাজা রায়চৌধুরী যখন-তখন খুন হয়ে যেতে পারেন। আমি তোমাদের ভালর জন্যই এই কথা বলছি। আরও একটা কথা, আজ হোটেল থেকে বেরিও না, কাল সকালে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবে। রাজা রায়চৌধুরীকে এক্ষুনি এই কথা জানিয়ে দাও!

এর পরেই লাইন কেটে গেল, সন্তু তবুও টেলিফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। এই সব কথার মানে কী? হোটেলে পৌঁছবার পর আধ ঘণ্টাও কাটেনি, এর

মধ্যেই কেউ টেলিফোনে তাদের ভয় দেখাচ্ছে? যারা টেলিফোন করল, তারা কি কাকাবাবুকে সত্যি চেনে? যদি চিনত তা হলে তারা ঠিকই জানত যে, এরকম বোকার মতন ভয় দেখিয়ে কাকাবাবুকে কোনও জায়গা থেকে সরানো যায় না।

সন্তুর ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। একটু আগেই কাকাবাবু বললেন, এখানে ডাকাত-গুণ্ডাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, এখানে স্রেফ বেড়ানো আর বিশ্রামের জন্য আসা। এ-কথা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কেউ যেন হুমকি দিল, এই দেশে কাকাবাবু যখন-তখন খুন হতে পারেন! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, এরকম একটা কথা আছে না?

২. অমল আর মঞ্জু

বিকেল চারটের সময় অমল আর মঞ্জু এসে উপস্থিত। কাকাবাবু একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর সন্তু বসে-বসে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প পড়ছে, এখানে সে ওই একটা বইই সঙ্গে এনেছে।

দুপুরে ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে নিয়েছিল। জেব্রা-জিরাফের মাংস নয়, চিনে খাবার। তাদের হোটেলেই অনেক রকম খাবারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কাকাবাবু ছোটখাটো দোকানে বসে খেতে ভালবাসেন বলে বেরিয়েছিলেন। একটা ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি টাকা ভাঙালেন, পোস্ট অফিসে গিয়ে এ-দেশের কিছু স্ট্যাম্পও কিনলেন। খাওয়ার পর খানিকটা হাঁটা হল এদিক-ওদিক। রাস্তার দুপাশে সাজানো দোকানপাট। সন্তুর আশ্চর্য লাগল। দেখে যে, প্রায় সব দোকানই চালাচ্ছে ভারতীয়রা।

হোটেলে ফেরার পর রিসেপশান কাউন্টার থেকে কাকাবাবুকে একটা স্লিপ দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা আছে যে অশোক দেশাই নামে একজন লোক ফোন করেছিল, সে সন্ধে সাড়ে ছাঁটার সময় কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য হোটেলে আসবে।

তারপর নিজেদের সুইটে এসে কাকাবাবু বলেছিলেন, তুই তো প্লেনে খুব মুক্তি দিয়েছি, সন্ধু! আমার যুদ্ধ হন। আমি এখন একটু ঘুমিয়ে

অমল এসেই হইচই করে বলল, এ কী, চুপচাপ বসে আছ? এমন চমৎকার দিনটা হোটেলে বসে কাটাবার কোনও মানে হয়? চলো, বেরোবে না? তৈরি হয়ে নাও

কাকাবাবুর খুব পাতলা ঘুম, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন।

মঞ্জু অমলকে মৃদু বকুনি দিয়ে বলল, তুমি কাকাবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তো? তুমি এত জোরে কথা বলো কেন?

কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, যা ঘুমিয়েছি, তাতেই যথেষ্ট হয়েছে। এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে।।

অমল বলল, চলুন, সিংহ দেখতে যাবেন না? নাইরোবিতে এলে সবাই প্রথমে তো তাই-ই করে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কত দূরে যেতে হবে বলে তো? আমাকে সাড়ে ছাঁটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, একজন দেখা করতে আসবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মধ্যেই ফিরে আসা যাবে। বেশি দূর নয়।

এইটুকু সময়ের মধ্যে যাব। আর সিংহ দেখে আসব? চিড়িয়াখানায় নাকি?

অমল হা-হা করে হেসে উঠে বলল, মঞ্জু এবারে তুমি বলে দাও! গত বছর অনিলন্দা যখন এসেছিল, তাকে আমরা প্রথমদিনই সিংহ দেখিয়েছিলুম কি না।

মঞ্জু বলল, নাইরোবি শহরটাকেই বলতে পারেন চিড়িয়াখানা, মানুষরা এর মধ্যে থাকে। আর বাকি খোলা জায়গায় জন্তু-জানোয়াররা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি, বেরোলে দেখবেন, শহরের এক দিকটায় মাইলের পর মাইল লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। ওই জালের মধ্যে আমরা আছি, আর জন্তু-জানোয়াররা আছে বাইরে। মনে করুন, কলকাতা শহরটার একদিক জাল দিয়ে আটকানো আর বেলেঘাটা, দমদম, ওইসব জায়গায় সিংহ, হাতি, গণ্ডার, এইসব ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অমল সন্তুকে জানলার কাছে টেনে এনে বলল, ওই যে দূরে ফাঁকা জায়গা দেখতে পাচ্ছ, আমরা ওইখানটায় যাব।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। সন্তু, রুম সার্ভিসে চার কাপ চা বলে দে তো!

সন্তু টেলিফোন তুলে চায়ের অর্ডার দিল। অমল জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, সন্ধেবেলা আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে আসবে জানতে পারি কি?

অশোক দেশাই। তুমি চেনো?

ওরে বাবা, তাকে কে না চেনে। সে তো বিরাট লোক।

বিরাট মানে? খুব মোটা?

না, বিরাট বড়লোক। জানেন-তো, গুজরাটিরাই এখানকার অনেক ব্যবসা কন্ট্রোল করে। এই অশোক দেশাই তাদের মধ্যে আবার টপে। তবে, আজকালকার বড়লোকরা কিন্তু মোটা হয় না। বাড়িতে নিজস্ব সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে, টেনিস খেলে...এই অশোক দেশাই তো চালচলনে পাক্কা সাহেব।

এই অশোক দেশাইয়ের এক আত্মীয়, তার নাম ভুলাভাই দেশাই, সে থাকে আমেদাবাদে। কিছুদিন আগে তার আমি একটা উপকার করেছি বলে সে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।

নিশ্চয়ই কোনও কেস হাতে নিয়ে এসেছেন? না, না, আমি আগে থেকে জানতে চাই না, আস্তে-আস্তে শুনব। কিন্তু এই নাইরোবি শহরটা এক হিসাবে নিরামিষ জায়গা, এখানে চুরি-ডাকাতি অবশ্য রোজ লেগেই আছে, খুন-টুনও হয়, কিন্তু তার চেয়ে বড় কিছু ঘটে না! আপনি তো আর সাধারণ খুন বা ডাকাতির ব্যাপারে আসবেন না।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আরে না, না, আমি কোনও কাজ নিয়ে আসিনি, শুধু বেড়াতে এসেছি। জিজ্ঞেস করো না। সন্তুকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আপনারা পি. আর. লোহিয়া বলে কাউকে চেনেন?

অমল ভুরু কুঁচকে বলল, পি. আর. লোহিয়া? না, কে বলে তো?

মঞ্জু বলল, পি আর লোহিয়া মানে পুরুষোত্তম রতনদাস লোহিয়া। বিরাট উকিল। লন্ডনেও কেস লড়তে যান। কাগজে প্রায়ই নাম বেরোয়।

অমল বলল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো অতি ধুরন্ধর লোক। সরকারের উঁচু মহলে খুব চেনা শুনো। প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি তার বন্ধু। ওই অশোক দেশাইয়ের সব কোম্পানিরও উনি বাঁধা ল-ইয়ার। তুমি তাকে চিনলে কী করে?

সন্তু বলল, আসবার সময় প্লেনে দেখা হয়েছিল।

কাকাবাবু বললেন, লোহিয়া আমাকে বলেছিল, সে এখানে ব্যবসা করে।

মঞ্জু বলল, বোধহয় নিজের আসল পরিচয়টা জানাতে চায়নি।

সন্তু একবার ভাবল, দুপুরবেলা টেলিফোনের হুমকির ব্যাপারটা অমলদের জানাবে কি না! বাথরুম থেকে বেরিয়ে সন্তুর মুখে ওই টেলিফোনের কথাটা শুনে কাকাবাবু কোনও গুরুত্বই দেননি। উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটা নিশ্চয়ই ওই ছেলেটি, এয়ারপোর্টে যার সঙ্গে আলাপ হল, সেই অমলের কাণ্ড। তোর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে।

সে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, কাকাবাবুর অনুমান সত্যি কি না! কিছুই বোঝা গেল না। সন্তুর অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিফোন করেছিল। অন্য লোক।

সন্তু অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, আমরা চাঁদের পাহাড় দেখতে যেতে পারি না? বিভূতিভূষণের লেখায় যে পাহাড়টার কথা পড়েছি।

মঞ্জু বলল, হ্যাঁ, যেতে পারে, তবে সেটা কেনিয়ায় নয়, উগান্ডায়। পাশের দেশ।

অমল বলল, সেখানে এখন মিলিটারির রাজত্ব। যখন তখন রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। অবশ্য কাকাবাবুকে কেউ মারতে পারবে না।

এই সময় একজন এসে চা দিয়ে গেল। মঞ্জু চা ঢেলে দিল সবাইকে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিয়ে বললেন, স্বাদটা অন্যরকম।

অমল বলল, এখানকার চা। এতে আমাদের দার্জিলিংয়ের ফ্লেভার তো পাবেন না। সেইজন্য আমি কফি খাই। এখানকার কফি খুব ভাল।

সন্তু দুচুমুক দিয়ে রেখে দিল। তার এমনিই চা খেতে ভাল লাগে না।

একটু পরেই ওরা নেমে এল নীচে। হোটেলের ফুটপাথে অনেক গাড়ি রয়েছে বলে আমল তার গাড়ি পার্ক করেছে একটু দূরে। রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে।

অমল বলল, কাকাবাবু, আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।

কাকাবাবু বললেন, তার দরকার নেই, চলো, আমার গাড়ির কাছেই যাচ্ছি।

অমল কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, না! রাস্তা পার হতে আপনার অসুবিধে হবে, দেখছেন না, কত গাড়ি যাচ্ছে! আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট করে নিয়ে আসছি গাড়িটা?

কাকাবাবুর কিছু-কিছু ছেলেমানুষি জেদ আছে। কেউ যদি তাঁকে কোনও অসুবিধের কথা বলে, তা হলে তিনি সেটা করবেনই। ক্রচ নিয়ে তাঁর হাঁটুড়ে

অসুবিধে হবে, এরকম অনেকেই মনে করে।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, কোনও অসুবিধে নেই, আমরা গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাব।

মঞ্জু বলল, সেটাই সুবিধে হবে, গাড়িটা আনতে গেলে অনেকটা ঘুরে আসতে হবে।

ওরা মাঝ-রাস্তায় আসতেই হঠাৎ একটা থেমে-থাকা স্টেশান ওয়াগন ইউ টার্ন নিয়ে ছুটে এল ওদের দিকে। সোজা ওদের ওপর দিয়ে চলে যাবে মনে হল। চোখের নিমেষে যে-যেদিকে পারল লাফ দিল, কে যেন হাত ধরে টান মারাল সন্তুর।

তারপরেই সে ঘুরে দেখল স্টেশান ওয়াগনটা অন্য দুটো গাড়িকে ধাক্কা মারতে মারতে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো।

রাস্তার দুপাশে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা বিরাট দুর্ঘটনা হতে-হাতে বেঁচে গেল। সন্তু দেখল, কাকাবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামার ধুলো ঝাড়ছেন। সন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, দরকারের সময় আমি এই খোঁড়া পায়েই প্রায় হনুমানের মতন লাফাতে পারি। দ্যাখ তো, আমার ক্রাচ দুটো ঠিক আছে কি না?

মঞ্জু ছুটে এসে বলল, আপনাদের লাগেনি তো?

অমল মুখ ভেংচিয়ে বলল, এখানকার কিছু-কিছু লোক এমন বিচ্ছিরি গাড়ি চালায়, ট্রাফিকের কোনও নিয়ম মানে না...নিশ্চয়ই ওই ড্রাইভারটা নেশা করেছিল, নইলে এমন ভিড়ের রাস্তায় কেউ অত জোরে ইউ টার্ন নেয়?

সন্তুর মুখখানা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এটা সাধারণ কোনও অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার নয়। লোকটা ইচ্ছে করেই তাদের চাপা দিতে এসেছিল। এক ঝলকের জন্য সন্তু ড্রাইভারটার মুখ দেখতে পেয়েছিল। গাল-ভর্তি দাড়ি, চোখে কালো চশমা, মাথায় ফেল্টের টুপি। টেলিফোনে যে ভয় দেখিয়েছিল, সে বলেছিল হোটেল থেকে না বেরোতে। সে বলেছিল, কাকাবাবুর প্রাণের ভয় আছে।

অমল ক্রাচ দুটো কুড়িয়ে এনে বলল, আপনার একটা ক্রাচ। ড্যামেজ হয়ে গেছে। বদলাতে হবে। তার কোনও অসুবিধে নেই। ক্রাচ দুটো চট করে ছেড়ে দিয়ে আপনি ভাল করেছেন।

মঞ্জু বলল, ক্রাচ সঙ্গে নিয়ে তো লাফানো যায় না! ইশ, আর-একটু হলে কী কাণ্ড হয়ে যেত।

কাকাবাবু বললেন, চলো, শেষ পর্যন্ত কারও তো কিছু হয়নি। সুতরাং এটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না। ওই গাড়ির নম্বর টুকে রাখলেও কোনও কাজে লাগত না।

মঞ্জু বলল, বাবাঃ, আমার এখনও বুক কাঁপছে।

গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। অমল তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। কাকাবাবু সামনের সিটে বসেছেন, ক্রাচ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে গাড়ি চালানো যাবে না।

অমল জিজ্ঞেস করল, তা হলে কি আগে আপনার ক্রাচটা বদলে আনব?

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, নাঃ, তার দরকার হবে না। তার দিয়ে বেঁধে কাজ চালাতে হবে। আমার বিশেষ একটা চেনা দোকান ছাড়া আমি অন্য যে-কোনও জায়গার ক্রচ ব্যবহার করি না। তারপর, যেন একটা মজার কথা বলছেন, এইভাবে হাসতে হাসতে বললেন, লোকটা আনাড়ির মতন গাড়ি চালিয়ে আমার একটা ক্রাচের ক্ষতি করে দিয়েছে, এজন্য ওর কিছু একটা শাস্তি পাওয়া উচিত। কী বলো?

অমল বলল, ওকে আর আপনি পাচ্ছেন কোথায়?

মঞ্জু বলল, তাড়াতাড়ি চলো, এরপর সন্ধে হয়ে যাবে।

ওরা ঠিকই বলেছিল, ন্যাশনাল পার্কের গেটে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। সেই গেটে টিকিট কেটে নিয়ে নিজস্ব গাড়িতেই ভেতরে ঢুকে পড়া যায়। একটা পিচ-বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গেছে, একটু পরেই ডান-দিকে বাঁ-দিকে মেঠো পথ কিংবা ইচ্ছে করলে মাঠের মধ্যেও নেমে পড়া যায়।

মাঝে-মাঝে একটা-দুটো বড় গাছ। আর সবই প্রায় ঘাসজমি, কোথাও কোথাও পাথুরে শুকনো মাটি। আমাদের দেশের ন্যাশনাল পার্ক বলতে যে বিশাল-বিশাল গাছের ঘন জঙ্গল বোঝায়, তার সঙ্গে কোনও মিলই নেই।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই দেখা গেল এক ঝাঁক হরিণ।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, পোষা?

মঞ্জু বলল, ধ্যাত? এখানে কোনও কিছুই পোষা নয়। এরপর এত ঝাঁকে-ঝাঁকে হরিণ দেখবে যে, তুমি একসঙ্গে অত গোরু-ছাগলও কখনও দ্যাখোনি।

সত্যি তা-ই, নানারকম হরিণের ঝাঁক চোখে পড়তে লাগল। অনবরত। এক জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল দুটো উটপাখি, অমল দ্রুত গাড়ি চালিয়ে গেল সেদিকে, কিন্তু তার আগেই ধুলো উড়িয়ে ছুটে সেই বিশাল পাখি দুটো উধাও হয়ে গেল যেন কোথায়!

আধঘণ্টার মধ্যেই ধৈর্য হারিয়ে অমল জিজ্ঞেস করল, সিংহ কোথায়? এই মঞ্জু, সিংহ দেখা যাচ্ছে না কেন?

মঞ্জু বলল, আমি কী করে বলব? আমি কি আগে থেকে অর্ডার দিয়ে সিংহ রেডি করে রাখব?

অমল বলল, কিন্তু সেবার যে অনিলদাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিংহ দেখানো হল?

অনিলদার লোক ভাল ছিল! সিংহরা তো সব সময় এক তল্লাটে থাকে না।

জানেন কাকাবাবু, মঞ্জু এখানে এক-একা চলে আসে। ও মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার দেখতে বেশি ভালবাসে। ও এলেই নাকি সিংহ দেখতে পায়।

হ্যাঁ। আমার সিংহ দেখতে ভাল লাগে। যতবার দেখি, ততবারই ভাল লাগে। সিংহর কত ছবি তুলে নিয়ে গেছি, তাতেও তোমার বিশ্বাস হয়নি?

এখানকার সিংহরা এমন ট্রেইন্ড হয়ে গেছে যে, ক্যামেরার সামনে দিব্যি পোজ মেরে দাঁড়ায়।

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কী? ওটা কী?

সবাই একসঙ্গে ডান দিকে তাকাল। একটু দূরে ঘাসজমির পাশে একটা মস্ত বড় হরিণ শুয়ে ছটফট করছে, তার পেটটা চিরে গেছে। অনেকখানি, সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

অমল ফিসফিস করে বলল, হরিণটাকে মেরেছে, তা হলে সিংহটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে।

মঞ্জু বলল, উহুঁ তা মনে হয় না। সিংহ তো এমনি-এমনি হরিণ মারে না। খিদে পেলেই মারে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করে। ফেলে রেখে তো চলে যায় না।

কাকাবাবু বললেন, আমি যতদূর জানি, সিংহর বদলে সিংহীই শিকার করে বেশি। সিংহরা অলস হয়।

মঞ্জু বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। সিংহ-পরিবারে বউরাই খাটাখাটনি করে বেশি। তারাই খাবার জোগাড় করে।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে বোধহয় একটা সিংহী এইমাত্র হরিণটাকে মেরে রেখে তার ছানাপোনা আর অলস স্বামীকে ডাকতে গেছে।

অমল জিজ্ঞেস করল, মঞ্জু, এই হরিণটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা যায় না? আমাদের গাড়িতে যদি তুলে নিই, গেটের সামনেই ওদের হাসপাতাল আছে।

সন্তু বলল, হ্যাঁ, চলুন, তুলে নিই!

সন্তু গাড়ির দরজা খুলতে যেতেই মঞ্জু তার হাত চেপে ধরে বলল, তোমরা কি পাগল হয়েছ? এসব জায়গায় কক্ষনো গাড়ি থেকে নামতে নেই। গাড়ি থেকে নামলে যখন-তখন বিপদ হতে পারে। এই ঘাসবনে যদি কোনও লেপার্ড লুকিয়ে থাকে…ওরা কী রকম পাজি হয় তোমরা জানো না…

কাকাবাবু বললেন, সে-কথা ঠিক, গাড়ি থেকে নামটা বিপজ্জনক। আইনেও বোধহয় নিষেধ আছে। তা ছাড়া, আমার তো মনে হয়, জঙ্গলের রাজত্বে জন্তু-জানোয়ারদের ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

সন্তু তবু ক্ষুণ্ণভাবে বলল, এখানে সিংহ-টিংহ কিছু নেই। গাড়ির আওয়াজ শুনে পালিয়েছে। হরিণটা শুধু শুধু…

মঞ্জু বলল, আফ্রিকার সিংহ গাড়িটাড়ি দেখে ভয় পায় না, গ্রাহ্যই করে না!

এই সময় আর-একটা গাড়ি এসে একটু দূরে দাঁড়াল। সন্তু অমনি উত্তেজিতভাবে বলল, ওই তো, ওই তো, সেই গাড়িটা?

অমল জিজ্ঞেস করল, সেই গাড়িটা মানে! ও হ্যাঁ, এটাও তো দেখছি একটা স্টেশন ওয়াগন, অনেকটা একই রকম দেখতে, তবে সেটার রং খয়েরি ছিল না?

সন্তু বলল, না, মেরুন ছিল। এই গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে এসেছিল।

অমল বলল, এই একইরকম গাড়ি নাইরোবি শহরে অনেক আছে। আমাদের অফিসেও একটা আছে। মঞ্জু, তুমি সেই গাড়িটার নম্বরটা দেখে রেখেছিলে?

না। এমন আচমকা এসে পড়েছিল যে, খেয়ালই করিনি। তবে ড্রাইভারটার চেহারা যেন দেখেছিলুম এক পলক।

সন্তু বলল, ড্রাইভার বদলে গেছে। তখন ড্রাইভারের দাড়ি-গোঁফ ছিল, এর কিছু নেই। এ অন্য লোক হতে পারে, কিন্তু এটাই সেই গাড়ি!

অমল হেসে বলল, এটা তুমি কী করে বলছি, সন্তু? বললুম না, এই একই মডেল, একই রঙের অনেক স্টেশান ওয়াগন আছে নাইরোবি শহরে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, তোমরা অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করছি। ওই দ্যাখো, সিংহীটা এসে গেছে?

সত্যিই এর মধ্যে একটি সিংহী এসে মুমূর্ষ হরিণটার পেটের কাছে কামড়ে ধরে টানাটানি করছে। হরিণটার গলা দিয়ে বেরোচ্ছে একটা বিকৃত আওয়াজ। সিংহীটার পেছনে রয়েছে দুটো বাচ্চা সিংহ।

কাকাবাবু বললেন, সিংহীটার বোধহয় শিগগিরই ডিভোর্স হয়ে গেছে, তাই ওর স্বামী আসেনি, ছেলেমেয়েরা এসেছে।

অমল লাফিয়ে উঠে বলল, ক্যামেরা! মঞ্জু, তোমার ব্যাগ থেকে ক্যামেরটা বার করে।

মঞ্জু কচুমাচু মুখে বলল, এই যাঃ! ক্যামেরাটা আছে, কিন্তু আসবার সময় ফিলম কিনে আনব ভেবেছিলুম!

অমল নিজের মাথার চুল চেপে ধরে বলল, হোপলেস! এরকম একখানা

সন্তু আগে কখনও সিংহী। দেখেনি। সিংহ বলতেই কেশর সমেত প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা পশুরাজের কথা মনে পড়ে। সেই তুলনায় সিংহীকে দেখতে এমন কিছুই না। প্রায় একটা খুব বড়সড় কুকুরের মতন।

সিংহীটা একটা জ্যান্ত হরিণের পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ-দৃশ্য সন্তুর দেখতে ইচ্ছে হল না। সে আবার স্টেশান ওয়াগনটির দিকে তাকাল। ড্রাইভার ছাড়া সে-গাড়িতে আর কোনও

যাত্রী নেই। তা হলে শুধু শুধু অতবড় গাড়ি নিয়ে একলা একটা লোক এখানে এসেছে কেন? ড্রাইভারটাও সিংহীটার হরিণ-খাওয়া দেখছে না, যেন ও ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহই নেই। সে-ও তাকিয়ে আসে সন্তুদের গাড়ির দিকে। তার দাড়িগোঁফ নেই, মাথায় টুপি নেই কিন্তু চোখে কালো চশমা।

ওই লোকটা যদি তার বড় গাড়ি নিয়ে সন্তুদের গাড়িটা ধাক্কা মেরে উলটিয়ে দেয়, তা হলেও কেউ জানতে পারবে না এখানে। সন্তুর দৃঢ় ধারণা হল, ওই লোকটা সেই মতলবেই এসেছে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।

সন্তু কিছু বলবার আগেই আরও দুটি গাড়ি এসে থামল সেখানে। একটা জিপ, আর একটা স্টেশান ওয়াগন। এখানকার নিয়মই এই কোথাও একটা-দুটো গাড়ি থামলেই অন্য গাড়িরা সেখানে এসে ভিড় করে কিছু দেখতে পাবার আশায়। দুটি গাড়িরই ছাদ খোলা ভর্তি আমেরিকান টুরিস্ট! তাদের কাছে নানা রকম ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরাই তিন চারটে।

দেখা গেল, এই সিংহীটার ছবি তোলার ব্যাপারে বেশ আপত্তি আছে। সে সবেমাত্র তার ছানা দুটোকে ডিনার খাওয়া শেখাচ্ছিল, ভিডিও ছবি তোলার আলো তার গায়ে এসে পড়ায় সে একবার বিরক্তভাবে এদিকে তাকাল, তারপর হরিণটার পেটে একটা বড় কামড় বসিয়ে টানতে টানতে ঘাসবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হরিণটা তখনও ডাকছে।

আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা হল, কিন্তু সিংহীটাকে আর দেখা গেল না।

অমল বলল, তা হলে এবার ফেরা যাক! দেখা তো হল!

পরে যে গাড়ি দুটো এসেছিল, সে দুটোও স্টার্ট নিয়েছে। কিন্তু মেরুন রঙের স্টেশান ওয়াগনটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। কালো চশমা পরা ড্রাইভারটা তাকিয়ে আছে সন্তুদের দিকে।

সন্তু বলল, আগে ওই গাড়িটা চলে যাক!

অমল বলল, কী ব্যাপার, সন্তু, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, সন্তু যখন ভাবছে ওই গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে এসেছিল, তখন একবার চেক করে দেখা উচিত। সন্তু তো সহজে ভুল করে না। অমল, তুমি গাড়িটা নিয়ে ওই গাড়িটার একেবারে কাছে চলো তো। ওই ড্রাইভারের সঙ্গে একবার কথা বলব।

অমল বলল, হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে।

সে তার গাড়িটাকে ব্যাক করতে লাগল। একটু বেশি পেছনে চলে গিয়ে সেটা নেমে গেল রাস্তার নীচে। তার ফলে, গাড়িটা আবার তুলতে খানিকটা সময় লাগল। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই স্টেশান ওয়াগনটা হুশ করে বেরিয়ে গেল উলটো দিকে।

অমল গাড়িটা সোজা করার পর জিজ্ঞেস করল, ওকে ফলো করব?

কাকাবাবু বললেন, নাঃ, তার দরকার নেই। চলো, এবারে গেটের দিকে ফিরে চলো।

মঞ্জু বলল, আমার মনে হয়, তুমি ভুল করছ সন্তু। এই গাড়িটা নিরীহ, নির্দোষ।

সন্তু আর কিছু বলল না।

অমল বলল, আর-একটু ঘুরব? এইভাবে হাতি-টাতি দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, না, এখন ফেরা দরকার। তা ছাড়া, ওই তো আকাশে হাতি দেখা যাচ্ছে।

সামনের আকাশে এমনভাবে মেঘ জমে আছে, ঠিক যেন মনে হয় দুটো ঐরাবত গুড় তুলে লড়াই করছে। এখানে আকাশ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শেষ সূর্যের আলোয় অনেক রকম রং ঠিকরে পড়ছে। অপূর্ব দৃশ্য। সন্তু অনেকদিন একসঙ্গে এতখানি আকাশ দ্যাখেনি।

অমল বলল, ফ্যান্টাস্টিক! এখানে সবাই শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখতে আসে, অন্য কোনও দিকে তাকায়ই না। ডান পাশের গাছটায় দেখুন, কী রকম বড়-বড় জবাফুল ফুটে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, জবাফুলের এত বড় গাছ হয়? এ তো বেশ শক্তপোক্ত গাছ দেখছি।

অমল বলল, হয়তো এ-ফুলের অন্য কোনও নাম আছে। কিন্তু ঠিক জবাফুলের মতন দেখতে না?

ফেরার পথে আরও অনেক হরিণ দেখা গেল। গোটা-পাঁচেক জেব্রা একেবারে রাস্তার ওপর এসে পড়ে ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল। গাড়ির সামনে সামনেই।

অমল বলল, জেব্রাগুলো একেবারে বোকা হয়। আসলে গাধা তো! ওদের গুলি করে মারা কত সহজ দেখুন।

মঞ্জু বলল, এত সুন্দর প্রাণী, ওদের দেখে তোমার গুলি করে মারার কথা মনে এল?

অমল থতমত খেয়ে বলল, আমি কি মারব নাকি? বলছি যে, গুলি করে মারা সহজ। আগে সাহেবরা কত মেরেছে।

মঞ্জু বলল, এক সময় নাইরোবি শহরে জেব্রা-টানা গাড়ি চলত। আমি ছবিতে দেখেছি। আমাদের দেশে যেমন গোরুর গাড়ি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এখন বুঝি জেব্রা কমে গেছে।

মঞ্জু বলল, কমেছে কী, বেড়েছে! এখন মারা নিষেধ তো। শহর ছেড়ে একটু বেরোলেই শত শত জেব্রা দেখা যায়। অনেক সময় জেব্রার জন্য গাড়ি আটকে যায়।

অমল একবার জোরে হর্ন বাজাতেই জেব্রার দলটা আরও ভয় পেয়ে পাশের দিকে নেমে গেল হুড়মুড়িয়ে। এমনভাবে তারা লাফাল যে, দেখলে হাসি পায়।

অমল বলল, আজ জিরাফ দেখা গেল না। জিরাফগুলো গাড়ির সামনে এসে পড়লে আরও মজা লাগে। একবার নাইভাসা লোক দেখতে যাবার সময় রাস্তায় কতগুলো জিরাফ এসে পড়েছিল, তোমার মনে আছে, মঞ্জু?

মঞ্জু বলল, আমার জিরাফ দেখলে খুব মায়া হয়। অতবড় চেহারা, কিন্তু কী রকম ছোট্ট মুখখানা। এত জন্তু থাকতে ভগবান শুধু ওদেরই যে কেন বোবা করেছেন, তাই-ই বা কে জানে?

অমল বলল, আমার জিরাফ দেখলেই মনে হয় ইনকমপ্লিট। তোমাদের ভগবান যেন জিরাফকে গড়তে গড়তে হঠাৎ ভুলে গিয়ে অন্য কোনও কাজে মন দিয়ে ফেলেছেন।

গল্প করতে করতে গোট পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া গেল। মঞ্জু বলল, এখন আমাদের বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবেন?

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, সাড়ে ছাঁটার মধ্যে ফিরতে হবে, দেরি হয়ে যাবে। কাল যাব বরং। এখন আমাদের হোটেলে পৌঁছে দাও!

সন্তুর আবার চোখ আটকে গেছে সামনের দিকে। একটু দূরে সেই স্টেশন ওয়াগনটা থেমে আছে।

সে বলল, আমলদা, ওই যে দেখুন!

অমল মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, নাইরোবি শহরে ঠিক এই একই রঙের, একই মডেলের অন্তত একশোটা স্টেশান ওয়াগন আছে, এটা তার মধ্যে তৃতীয়টা।

মঞ্জু বলল, তা ছাড়া সেটা তো উলটো দিকে চলে গেল। আমাদের আগে ফিরবে। কী করে?

অমল বলল, তা অবশ্য পারে, ফেরার অনেকগুলো রাস্তা আছে। আমরা আস্তে আস্তে এসেছি।

কাকাবাবু বললেন, দ্বিতীয় গাড়িটার নম্বর আমি লক্ষ করেছিলুম। এটা সেটাই। চলো, ওর কাছে গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করা যাক।

অমল নিজের গাড়িটা সেই গাড়িটার সামনে নিয়ে পার্ক করে নেমে দাঁড়াল। কাকাবাবুও নামলেন। কিন্তু স্টেশান ওয়াগনটিতে এখন কোনও ড্রাইভার নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

৩. হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন

ঠিক সাড়ে ছটায় হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন এল। অশোক দেশাই দেখা করতে এসেছেন। তিনি ওপরে আসতে চান।

সন্তু দরজা খুলে দিল। সেই মাইক নামের ছেলেটি অশোক দেশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আরও একজন লোক রয়েছে অশোক দেশাইয়ের সঙ্গে। ইনি একজন আফ্রিকান, পাক্কা সাহেবি পোশাক পরা। অশোক দেশাইয়ের পোশাকও সেইরকম। তাঁর গায়ের রং এত ফস যে, সাহেবদের মতনই দেখায়।

অশোক দেশাই দরজা দিয়ে ঢুকে কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গুড ইভনিং মিঃ রায়চৌধুরি। আশা করি নাইরোবি আপনার ভাল লাগছে।

কাকাবাবু সন্তুর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন।

অশোক দেশাই তাঁর সঙ্গীর দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ইনি মিঃ শ্যাম নিনজানে। ইনি এখানকার প্রেসিডেন্ট মই-এর আত্মীয়, এ-দেশের ফিনান্স সেক্রেটারি এবং আমার বিজনেস পার্টনার।

অশোক দেশাই এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যাতে বোঝা গেল যে, তাঁর সঙ্গীটি একজন বিশেষ কেউ-কেটা লোক। প্রেসিডেন্টের আত্মীয় হওয়াটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার।

মিঃ নিনজানে যে কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়েছেন তা তিনি লুকোবার সামান্য চেষ্টাও করলেন না। তিনি প্রায় হাঁ করে একবার কাকাবাবুকে দেখছেন, একবার অশোক দেশাইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন।

কাকাবাবু বললেন, বসুন, আপনারা বসুন!

মিঃ নিনজানে তবু দাঁড়িয়ে থেকেই অশোক দেশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এই.এই ভদ্রলোকের কথাই আপনি বলেছিলেন? ইনি...একজন অ্যাডভেঞ্চারার? ইনি... মানে... ইনিই পৃথিবীর অনেক জায়গায়...

অশোক দেশাই বললেন, ইনিই মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। আমার আংকল একে পাঠিয়েছেন।

কাকাবাবু হেসে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার মতন একজন খোঁড়া মানুষকে দেখে অবাক হয়েছেন?

মিঃ নিনজানে বললেন, হ্যাঁ, মানে, আমি ফ্র্যাংকলি বলছি, আমি অশোকের মুখে গল্প শুনেছিলাম, আপনি নাকি হিমালয় পাহাড়ে একদল ক্রুককে ধরবার জন্য এগারো-বারো হাজার ফিট ওপরে উঠেছিলেন? সেটা কি অনেক দিন আগের কথা?

কাকাবাবু বললেন, না, খুব বেশিদিন আগে না, বছর পাঁচ-ছয় হবে। আমার একটা পা অবশ্য তার আগেই অকেজো হয়ে গেছে।

কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? এই পা নিয়ে আপনি হিমালয় পাহাড়ে উঠেছিলেন কী করে?

বুঝিয়ে বলছি। বসুন আগে। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, পঙ্গু লজ্ঘয়তে গিরিং। তার মানে হল, ভগবানের কৃপা হলে আমার মতন কানা-খোঁড়া-পঙ্গুরাও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে। আপনি ভগবান মানেন?

হ্যাঁ, অফ কোর্স ভগবান মানি। আমি একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান।

আমি ভগবান বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি মানুষের অফুরন্ত মানসিক শক্তিকে। মনের জোর থাকলে মানুষ সব কিছু পারে। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে আমি পা পিছলে পড়ে মরে যেতেও পারি, তা বলে সেই ভয়ে আমি কোনওদিন পাহাড়ে উঠতে চাইব না, তা তো হয় না! কত লোক তো শহরের রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েও মরে!

তা তো বটেই।তা তো বটেই!

আপনারা চা কিংবা কফি কী খাবেন বলুন। কিছু আনাব?

অশোক দেশাই এবারে বললেন, মিঃ নিনজানে সন্ধের পর বিয়ার ছাড়া অন্য কিছু খান না। আমার কোনও রকম নেশা নেই। পানও খাই না। আমি মিঃ নিনজানের জন্য বিয়ার বলে দিচ্ছি।

মিঃ নিনজানে হাত তুলে বললেন, আমি যথেষ্ট বিয়ার পান করে এসেছি। রাত্তিরে আর-একটা জায়গায় নেমন্তন্ন আছে, সেখানে গিয়ে অনেক খেতে হবে। এখন কিছু খেতে চাই না। এখন কাজের কথা হোক।

কাকাবাবু বললেন, কাজের কথা কিছু আছে নাকি? আমি তো তা জানতুম না। আমার ধারণ আমরা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি।

অশোক দেশাই বললেন, না, মানে, আপনার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম নিয়ে দু-চারটে কথা বলার ছিল.

সন্তু ওঁদের কাছে না বসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। সে এক দৃষ্টিতে মিঃ নিনজানেকে লক্ষ করছে। ওঁকে অনেকটা বক্সার মহম্মদ আলির মতন দেখতে। কিন্তু ওঁর গলার আওয়াজটা কেমন যেন চেনা-চেনা। দুপুরে যারা ভয় দেখিয়ে টেলিফোন করেছিল, তাদের মধ্যে প্রথম যে-লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজি বলছিল, তার গলার আওয়াজটা ঠিক মিঃ নিনজানের মতন নয়? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? উনি কাকাবাবুকে ভয় দেখাতে যাবেন কেন?

কুবাবু বললেন, আমি মিঃ নিনজানেকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে মিঃ নিনজানে বললেন, নিশ্চয়ই। আপনার বয়েস কত?

হঠাৎ এই প্রশ্ন? মিঃ র্যাজা রায়চৌড্রি, আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করলেন কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না তো!

এমনিই, কৌতূহল। আমি আফ্রিকানদের বয়েস বুঝতে পারি না। আপনার মুখের চামড়া একটু কুঁচকে গেছে, কিন্তু আপনার চুল কুচকুচে

আমার বয়েস আটান্ন!

তা হলে তো আপনি আমার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড়। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য আমার চেয়েও ভাল, আপনার মাথায় কত চুল.আমি আজ পর্যন্ত একজনও টাক-মাথা আফ্রিকান দেখিনি।

মিঃ নিনজানে। এবারে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। এতক্ষণ বাদে তাঁকে বেশ সহজ মনে হল। তিনি পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

কাকাবাবু দুদিকে মাথা নাড়লেন।

মিঃ নিনজানে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তা হলে একটা মজার গল্প বলি শুনুন! আপনি ব্রাইট ক্রিম বলে চুলের একটা ক্রিম আছে, নাম শুনেছেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি, আমাদের দেশেও চলে।

একসময় আফ্রিকার কয়েকটা দেশে সেই ব্রাইট ক্রিমের খুব বিক্রি বেড়ে গেল। দোকানদাররা সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তখন যে বিলিতি কোম্পানি এই ক্রিম বানায়, তাদের টনক নড়ল। তারা বুঝতেই পারল না, হঠাৎ আফ্রিকায় তাদের চুলের ক্রিমের বিক্রি বাড়ল কেন? আফ্রিকানদের তো এত পয়সা নেই। হেড-অফিস থেকে দুতিন জন সাহেব এল খোঁজ-খবর নিতে। তারা কিছুই বুঝতে পারল না। প্রত্যেক

দোকানদার বলছে, সাহেব, আরও বেশি করে ব্রাইট ক্রিম পাঠাও! খদ্দের ফিরে যাচ্ছে, আমরা গালাগালি খাচ্ছি!

তারপর আরও দুজন বড়সাহেব এল মার্কেট রিসার্চ করতে। তাদের জিনিস বিক্রি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কেন যে এত বেশি বিক্রি হচ্ছে, তা কিছুতেই ধরতে পারছে না। প্রত্যেক মাসে ডিমান্ড দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছো!

তখন কোম্পানি ঠিক করল, আফ্রিকার এই কয়েকটা দেশে এই সুযোগে আরও ব্রাইট বিলক্রিম পাঠাবে, বিক্রি আরও বাড়বে! প্রত্যেক কাগজে বড়-বড় করে বিজ্ঞাপন দিল, ব্রাইট ক্রিম চুলের স্বাস্থের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চুল ভাল রাখতে হলে প্রত্যেক দিন ব্রাইট ক্রিম ব্যবহার করুন!

শুধু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নয়, গ্রামে-গ্রামেও এই বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং টাঙানো হল। তার ফলে কী হল বলুন তো, এই বিজ্ঞাপন বেরোবার পর ব্রাইট ক্রিম বিক্রি একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর কেউ ওটা কেনে না।

গল্প শেষ করে মিঃ নিনজানে বিরাট জোরে চেঁচিয়ে হাসতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, আমি কিন্তু গল্পটার মর্ম ঠিক বুঝতে পারলুম না?

অশোক দেশাই বললেন, বাকিটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে ব্যাপার কী জানেন, আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির লোক ওই ক্রিম কিনত টোস্টে মাখিয়ে খাবার জন্য। জিনিসটার স্বাদও ভাল, দামেও মাখনের চেয়ে শস্তা। যখন তারা জানল ওটা চুলের ক্রিম, তখনই তারা কেনা বন্ধ করে দিল। চুলের যত্ন করার জন্য পয়সা দিয়ে কোনও চুলের ক্রিম কেনার কথা সাধারণ লোক কল্পনাই করতে পারে না।

কাকাবাবুও হেসে বললেন, ভাল গল্প। আশা করি এটা সত্যি।

মিঃ নিনজানে বললেন, মোটেই সত্যি নয়। নিছকই গল্প। তবে, আপনি আমাদের চুলের কথা তুললেন তো...। জানেন, আমাদের এখানে অনেকে

অশোক দেশাই বললেন, এবারে আমার কথা সেরে নিই। সাড়ে সাতটার সময় আমার আর-একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মিঃ রায়চৌধুরী এখানে আপনার প্রোগ্রাম কী তা জানেন নিশ্চয়ই?

কাকাবাবু বললেন, প্রোগ্রাম তো সে-রকম কিছু নেই। ভুলাভাই দেশাই আমাকে বলেছেন। এখানে দু-একদিন থাকার পর আমরা অন্য একটা জায়গায় চলে যাব। মাসাইমারা ফরেস্টে নাকি আপনারা একটা নতুন হোটেল খুলেছেন? সেখানে আমাদের থাকার কথা।

অশোক দেশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, সেই ব্যাপারেই আপনাকে দু-একটা কথা বলতে এসেছি। আপনি এই হোটেলে যতদিন খুশি থাকতে পারেন। যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চান, ভিক্টোরিয়া লেক কিংবা কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ে, তারও সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু মাসাইমারা ফরেস্টে যে হোটেলে আপনাদের যাওয়ার কথা আমার কাকা আপনাদের বলে দিয়েছেন, সেখানে যাওয়াটা ঠিক হব কি না, তাতেই একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, আমরা সেখানে গেলে আপনাদের অসুবিধে হবে? তা হলে থোক, যাব না?

অশোক দেশাই একটু জোরে বলে উঠলেন, না, না, আমাদের অসুবিধে কিছু নেই। আপনি গেলে আমরা খুশিই হব। কিন্তু আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি, সেখানে গিয়ে যদি আপনার খারাপ লাগে, মানে...

কেন, সেখানে খারাপ লাগবে কেন! আপনার কোকা সে-জায়গাটার উচ্চ প্রশংসা করছিলেন। মাসাইমারা ফরেস্ট আমারও দেখার খুব ইচ্ছে আছে। বিশ্ববিখ্যাত ফরেস্ট, আমার ভাইপোকে নিয়ে এসেছি, ওরাও খুব ভাল লাগবে এই আশা করে...

তা হলে পুরো ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলতে হয়।

বলুন।

মাসাইমারা গেইম রিজার্ভের একেবারে মাঝখানে কয়েকটা হোটেল আছে। তার মধ্যে একটা আমরা নিয়েছি। এখনও কিনিনি। আপাতত ম্যানেজমেন্টের ভার নিয়েছি। ছ। মাস দেখার পর পুরোপুরি কিনে নেব, এরকম কথা আছে। সেই হোটেলের নাম লিটল ভাইসরয়।

অদ্ভুত নাম তো। ভাইসরয় আবার লিটল?

এ-নামটারও একটা ইতিহাস আছে। আগে ওখানে শুধু ভাইসরয় নামে একটা হোটেল ছিল। তারপর খুব কাছাকাছিই আর-একটা হোটেল খোলা হল, তার নাম দেওয়া হল লিটল ভাইসরয়। আসলে কিন্তু দ্বিতীয় হোটেলটা, যেটা নতুন সেটাই বেশি বড়। ক্রমে এক সময় মূল ভাইসরয় হোটেল উঠে গেল, কিন্তু অন্য হোটেলের নাম লিট্ল ভাইসরয়ই রয়ে গেল। এই হোটেলটাই এখন আমাদের।

সেখানে আমি গেলে আপনাদের কি অসুবিধে হবে?

না না, আমাদের অসুবিধের কোনও প্রশ্নই নেই। বরং আপনার মতন একজন মানুষ গেলে আমাদের খুবই উপকার হতে পারে। আমার কাকা সেই কথা ভেবেই আপনাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভাল-মন্দ সব দিক আপনাকে আগে জানানো দরকার বলে আমি মনে করি। সেটাই আমার নীতি।

মন্দ দিক কিছু আছে বুঝি?

মিঃ রায়চৌধুরী, লিটল ভাইসরয় খুব দামি হোটেল। ওটা চালাবার খরচ অনেক। প্রধানত ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরাই ওখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু গত তিন-চার মাস ধরে

ওখানে টুরিস্টের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। লোকে ভয়ে ওখানে যেতে চাইছে না। হোটেলের দুজন বোর্ডার রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খুঁজে পাওয়া যায়নি মনে হারিয়ে গেছে, না কোথাও কোনও জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়েছে?

প্রথমত ওখানে আমরা খুব সাবধানতা অবলম্বন করি। জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়ার প্রায় কোনও সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, কোনও জন্তু-জানোয়ারের মুখে যদি দৈবাৎ পড়েও যায়, কোনও জানোয়ারই তো মানুষের জামা-কাপড় সুদ্ধু খেয়ে ফেলে না। তাদের কোনওরকম চিহ্নই পাওয়া যায়নি।

সন্তু ফশ করে বলল, যদি কুমির কিংবা জলহস্তী জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়?

অশোক দেশাই সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, দুজন মানুষকে এক সঙ্গে জলের তলায় টেনে নেবে? এরকম ঘটনা এখানকার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। তা ছাড়া লোক দুটি তো বোকা নয়, দুজনেই জার্মান ব্যবসায়ী।

কাকাবাবু বললেন, সেই ঘটনাটি রটে গেছে, তাই টুরিস্ট যেতে চায় না?

শুধু সেই জন্যই নয়। এর পরেও যারা গেছে, তারা ফিরে এসে অভিযোগ করেছে যে, রাত্তিরে তারা ঘুমোতে পারে না। কিসের যেন একটা অস্বস্তি হয়। যদিও আমাদের ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই.হোটেলটা চালাতে গিয়ে এখন আমাদের খুবই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি ভেবে দেখুন। সেখানে যাবেন কি না।

মিঃ নিনজানে বললেন, আপনার কোনও বিপদ হোক, তা আমরা কেউ চাই না।

কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, হ্যারি ওটাংগোর ঠিক কী হয়েছিল। আপনারা জানেন?

দেশাই আর নিনজানে দুজনেই যেন চমকে উঠল। এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। নিনজানে একটা রুমাল বার করে কপাল মুছল, অশোক দেশাই বলল, আপনি...আপনি হ্যারি ওটাংগোর নাম জানলেন কী করে?

কাকাবাবু বললেন, উনি বিখ্যাত লোক, সারা পৃথিবীর লোক ওঁর নাম জানে। উনি কয়েক মাস আগে অদ্ভুতভাবে মারা গেলেন, কাগজে পড়েছি।

দেশাই বলল, উনি কোনও হিংস্র জন্তুর সামনে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, এইটুকুই আমরা জানি।

নিনজানে খানিকটা রুক্ষ গলায় বলল, ওই ওটাংগোর সঙ্গে আমাদের হোটেলের কী সম্পর্ক? মাসাইমারায় গেলে আপনাদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব।

কাকাবাবু হেসে বললেন, আমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে পারি। আমি সেজন্য ও-কথা জিজ্ঞেস করিনি।

দেশাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনি বেড়াতে এসেছেন, মনের সুখে বেড়ান। এখানকার ঝঞ্ঝাটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? সেজন্যই আপনাকে ওই হোটেলটায় পাঠাতে চাইছিলাম না। আবার পরের বছর আসুন না! তখন হোটেলটা ঠিকমতন চালু হয়ে যাবে।

কাকাবাবু হাসিমুখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর বললেন, আমাদাবাদের ভুলাভাই দেশাই অতি চালাক লোক। এখানে আমাদের পাঠাবার সময় এমনভাবে কথা বলল, যেন আমাকে কোনও কাজ করতে হবে না, মাথা খাটাতে হবে না, শুধু বেড়ানো আর বিশ্রাম। কিন্তু তার মনে একটা মতলব ছিল ঠিকই, এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে।

অশোক দেশাই বললেন, আপনি ওখানে না যেতে চাইলে আমরা মোটেই ইনসিস্ট করব না। আপনি যত দিন খুশি বিশ্রাম নিন, ইচ্ছে মতো বেড়ান, তারপর ফিরে যান।

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু বিপদের গন্ধ পেলে আমি যে সেখানে না গিয়ে পারি না। মাসাইমারা যেতেই হবে। কী বলিস, সন্তু?

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, আপনারা আমাদের যাবার ব্যবস্থা করুন।

আরও দু-একদিন বরং ভেবে দেখুন, তারপর ঠিক করুন।

না, না, কালই যাব। দেরি করার কোনও মনে হয় না। ফেরার সময় না। হয় নাইরোবি শহর ভাল করে দেখে যাব। এখান থেকে কী ভাবে যেতে হয়?

ছোট প্লেনে। আমাদের চাটরি করা প্লেন আছে।

তা হলে কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। তার আগে দু-একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার। এই যে হোটেলটা আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের কোনও কমপিটিটর আছে?

কমপিটিটর মানে? মিঃ নিনজানে আর আমি একটা জয়েন্ট কোম্পানির মালিক। এই কোম্পানির নামেই কয়েক মাস বাদে পুরোপুরি হোটেলটা কিনে নেবার কথা। এক সুইস কোম্পানি ওই হোটেলটার মালিক ছিল। তারা বিক্রি করে দিতে চাইছে।

আর কোনও কোম্পানি কি ওটা কেনার ব্যাপারে আগ্রহী?

আর কে কিনবে? অনেক টাকার ব্যাপার। ওই হোটেলটা যে কত বড় আর জঙ্গলের মধ্যে ওই রকম হোটেল চালানো যে কী শক্ত ব্যাপার, তা আপনি গেলেই বুঝবেন।

মিঃ নিনজানে বললেন, আমি যে হোটেল কিনতে চাইছি, সেটা কিনতে এ-দেশে আর কোনও লোকের সাহস হবে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাছাকাছি অন্য কোনও হোটেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই!

অশোক দেশাই বললেন, খুব কাছে অন্য কোনও হোটেল এখন আর নেই। সরকার থেকে আর কোনও হোটেল তৈরি করার অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না।

দুজন লোক যে উধাও হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে পুলিশ থেকে খোঁজখবর আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়েছিলাম। নাইরোবি থেকে স্পেশাল ফোর্স নিয়ে সবরকম তদন্ত করেছে, কিন্তু তারাও কোনও হদিস পায়নি।

ঠিক আছে, তা হলে ব্যবস্থা করুন, আমি আর আমার ভাইপো ওখানে গিয়ে দিন-সাতেক থাকব।

মিঃ নিনজানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যদি আপনি মিষ্ট্রিটা সলভ করতে পারেন, তা হলে আপনি পঁচিশ হাজার শিলিং পাবেন। আমরা আগে থেকেই ওই পুরস্কারটা ডিক্লেয়ার করে রেখেছি; গুড লাক, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী।

ওঁরা দুজন বেরিয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, তা হলে দুপুরে টেলিফোনটা কে করেছিল? অমলই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছিল তোর সঙ্গে?

সন্তু বলল, গলার আওয়াজটা কিন্তু ঠিক মিঃ নিনজানের মতন!

অমল অনেকদিন এ-দেশে আছে, ও আফ্রিকানদের গলার আওয়াজ নকল করতে পারবে। এতে আর আশ্চর্য কী আছে। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস? মিঃ নিনজানের মাথার চুল? উনি ব্রাইট ক্রিমের গল্প বললেন বটে। কিন্তু নিজে মাথায় কলপ মাখেন। এ-দেশের মানুষদেরও চুল খুব ঘন আর কোঁকড়া হয়, সহজে টাক পড়ে না, কিন্তু বয়েস বাড়লে সাদা হয় ঠিকই। মিঃ নিনজানের সব চুল কুচকুচে কালো। অশোক দেশাই সম্পর্কেও একটা ব্যাপার বুঝলাম না। অমল বলেছিল, ওঁর অনেকগুলো ব্যবসা, অনেক টাকা। কিন্তু

উনি এই হোটেলটা নিয়ে খুব চিন্তিত। এই হোটেলটা নিয়ে যখন এত গণ্ডগোল, তখন উনি না। কিনলেই তো পারেন। এখনও তো কেনা হয়নি। ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

সন্তু বলল, একবার কিনবেন ঠিক করেছেন তো, তাই জেদ চেপে গেছে বোধহয়।

ঠিক বলেছিস, জেদের বশে মানুষ অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।

কাকাবাবু, আমরা রাত্তিরে কোথায় খাব?

কেন, তোর খিদে পেয়ে গেছে নাকি? রাত্তিরে আমরা এই হোটেলেই খেয়ে নেব। রুম সার্ভিসে বলে দিলেই হবে। রাত্তিরে রাস্তায় বেরোলে যদি কেউ আবার গাড়ি চাপা দিতে আসে। সেই এক ঝামেলা। –

বিকেলে সত্যিই ওই গাড়িটা যে আমাদের চাপা দিতে এসেছিল, তা তুমি বিশ্বাস করো না?

চাপা দেবার চেষ্টা করলেও আমার মতন একটা খোঁড়া লোককে মারতে পারল না? লোকটা খুবই আনাড়ি বলতে হবে। যাক, তুই কেনিয়ার ম্যাপিটা বার কর তো! আমি খাবার অর্ডার দিচ্ছি, খাবার আসতে আসতে ম্যাপটা দেখে নিই।

সন্ধেবেলা ফেরার পথে ম্যাপটা কেনা হয়েছিল, সন্তু সেটা এনে টেবিলের ওপর খুলে দিল।

কাকাবাবু একটা পেনসিল তুলে বললেন, এই যে নাইরোবি শহর, আর এই হচ্ছে নাইরোবি ন্যাশনাল পার্ক, এখানে আমরা গিয়েছিলাম। বেশ বড় জায়গা। লেক ভিকটোরিয়া দেখেছিস? পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পানীয় জলের হ্রদ, এর তিন দিকে তিন দেশ, কেনিয়া, তানজানিয়া আর উগাণ্ডা। এখানে আরও অনেকগুলা হ্রদ আছে, সেগুলোও আমার দেখার ইচ্ছে আছে, সেসব হ্রদের নাম নাইভাসা, গিলগিল, নুকুরু, বারিংগো এই

সব। কেনিয়ার একটা নদীর নাম হিরামন, কী চমৎকার না! কিন্তু সেটা অনেক দূরে, সেদিকে যাওয়া যাবে না। এবারে মাসাইমারা কোথায় তুই খুঁজে বার কর তো!

সন্তু খুব মন দিয়ে খুঁজে খুঁজে একসময় আঙুল দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, দ্যাখ, তানজানিয়ার বর্ডারের একেবারে কাছেই। তানজানিয়ার ওপাশটায় আছে বিশ্ববিখ্যাত সেরিংগেট ফরেস্ট। এই অঞ্চলটা খুব ইন্টারেস্টিং, দু-একটা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে...

ওরা দুজনে ম্যাপ দেখতে দেখতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, এক সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ হল।

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, দ্যাখ তো, খাবার এসে গেছে বোধহয়।

সন্তু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, সেই মাইক নামে ছেলেটি হাতে একটা ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রের ওপরে একটা লম্বা সাদা খাম।

মাইক সরল সাদা হাসি হেসে বলল, তোমার আংকেলের জন্য একটা চিঠি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কে দিয়েছে?

মাইক বলল, একজন জেন্টলম্যান দিয়ে বলল, এক্ষুনি পৌঁছে দিতে। দ্যাখো, আমি সঙ্গে-সঙ্গে এনেছি, একটুও দেরি করিনি। কিন্তু!

কাকাবাবু বললেন, চিঠিটা নিয়ে আয়।

সন্তু খামটা কাকাবাবুর হাতে দিলে তিনি সেটা ছিঁড়ে একটা কাগজ বার করলেন। তাতে মাত্র একটা লাইন লেখা আছে। সেটা পড়ে কাকাবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, তিনি কাগজটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

কাগজটাতে টাইপ করা অক্ষরে লেখা আছে :

Dont Go To Masai-Mara.

সন্তু বিবর্ণ মুখে বলল, আমরা যে এখানে আছি, তা তো মাত্র দুজন লোক ছাড়া এখনও আর কেউ জানে না?

ভাঙানো আছে, তার থেকে ওকে দশটা শিলিং দিয়ে দে!

৪. প্লেনটা বেশ ছোট

প্লেনটা বেশ ছোট। ফকার ফ্রেন্ডশিপ, কুড়ি-বাইশজন যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা। এখন যাত্রী মাত্র পাঁচজন। সন্তু আর কাকাবাবু ছাড়া একজোড়া শ্বেতাঙ্গ দম্পতি, আর একজন বুড়োমতন সাহেব একেবারে সামনের দিকে বসে আছে। পাইলটের ঘরেও একজন মাত্র সঙ্গী, সেই লোকটিই একবার বেরিয়ে এসে সবাইকে একটা করে কোকাকোলার বোতল দিয়ে গেল।

প্লেনটা উড়ছে খুব নিচু দিয়ে, তলার সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। দেখবার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। নাইরোবি ছাড়বার পর প্রথম-প্রথম কিছু-কিছু ক্ষেত-জমি আর ছোট-ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল, তারপর থেকে শুধু পাথুরে ডাঙা। মাঝে-মাঝে ছোট-ছেট টিলা।

প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পর প্লেনটা নামছে মনে হল। সন্তু ভাবল, ওরা বুঝি পৌঁছে গেছে। তা অবশ্য নয়, এটা একটা ছোট্ট শহর, এর নাম বাতিটাবু। এয়ারপোর্ট বলতে কিছু নেই, মাঠের মাঝখানে রানওয়ে আর একখানা মাত্র ঘা।

এখানে একগাদা মুরগি, আলুর বস্তা, কয়েকটা তরমুজ, আনারস—এইসব তোলা হল প্লেনে।

কাকাবাবু বললেন, হোটেলের জন্য খাবার যাচ্ছে। জঙ্গলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না, রোজারোজ তা হলে এরকম প্লেনে করে খাবার নিয়ে যেতে হয়।

সন্তু বলল, নিশ্চয়ই এই হোটেলে থাকার অনেক খরচ!

তোর আর আমার তো সেই চিন্তা নেই। আমরা মালিকের অতিথি।

আমরা যে যাচ্ছি তা কি ওখানকার হোটেলের লোকরা জানে?

নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।

কাকাবাবু, কাল, রাত্তিরে ওই চিঠিটা কে পাঠাতে পারে?

আপাতত সে-চিন্তা আমি করছি না। যে-ই পাঠক, তার আসল উদ্দেশ্যটা কী সেটা আগে জানা দরকার।

এবার প্লেনটা আকাশে ওড়বার খানিক বাদে মাঝে-মাঝে একটু-একটু জঙ্গল দেখা যেতে লাগল। খুব ঘন নয়, দু-চারটে বড় গাছ, আর ঝোপঝাড়। একটা নদীর ধারে একগাদা জন্তু দেখা গেল, কী জন্তু তা চেনা যাচ্ছে না। তার খানিকটা পরেই গোটা-পাঁচেক হাতি।

সন্তু কাকাবাবুকে ডেকে দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, একজন সাহেব আমাকে একবার বলেছিল, ভারতবর্ষে যেমন সব জায়গায় পিলপিল করছে মানুষ, আফ্রিকায় সেইরকম জন্তু-জানোয়ার। এখানে মানুষের চেয়ে বন্যপ্রাণী অনেক বেশি।

নীচে বুনো হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সন্তু প্লেনের জানলা দিয়ে তা-ই দেখছে, এতে তার খুব মজা লাগল।

এর থেকেও বেশি মজা পাওয়া গেল একটু পরে।

মাসাইমারার লিটল ভাইসরয় হোটেলের নিজস্ব রানওয়ের ওপরে পৌঁছেও প্লেনটা নামতে পারল না, গোল হয়ে চক্কর দিতে লাগল। রানওয়ের ওপর ছড়িয়ে আছে একগাদা জেব্রা, আর ঠিক মাঝখানে গভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি। ওগুলো থাকলে প্লেন নামবে কী করে।

জানলা দিয়ে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ দম্পতিটি খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, এটা দেখে আমার আর-একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার রাঁচি শহর থেকে আমার কলকাতায় প্লেনে ফেরার কথা ছিল, বুঝলি! এয়ারপোর্টে এসে বসে আছি, পাটনা থেকে প্লেনটা এল, কিন্তু নামতে পারল না। এয়ারপোর্টের পাঁচিল ভাঙা, সেখান দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক গোরু রানওয়েতে ঢুকে পড়েছে, কয়েকটা ছেলে সেখানে আবার সাইকেল চালাচ্ছে। সেই সাইকেলওয়ালাদের সরানো গেলেও গোরুগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো গেল না, তাদের একদিকে তাড়া করলে অন্যদিকে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত প্লেনটা নামলেই না, বিরক্ত হয়ে চলে গেল!

সন্তু বলল, এখানে হাতি-জেব্রা কে সরাবে?

ককপিটের দরজা খুলে কো-পাইলট বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা চিন্তা করবেন না, এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনাদের ভাগ্য ভাল, দু-চারটে সিংহ এসে বসে নেই, সিংহদের সরানো খুব শক্ত। আমাদের তেল বেশি নেই, বেশিক্ষণ ওপরে চক্কর দেওয়া যাবে না।

এবারে দেখা গেল, গোটা তিনেক স্টেশান ওয়াগন আসছে একটু দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে। সেই গাড়িগুলো জেব্রাগুলোকে তেড়ে গেল। রাঁচি এয়ারপোর্টের গোরুদের মতন জেব্রাগুলোও একবার এদিকে আর একবার ওদিকে করতে লাগল, তারপর শেষ পর্যন্ত পালাল।

হাতি দুটো কিন্তু সহজে নড়েচড়ে না। তখন ফটফট করে ধোঁয়ার পটকা ফাটানো হল তাদের সামনে। তাতে তারা সামান্য একটু সরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ঘাড় ফিরিয়ে।

প্লেনটা আর ওপরে থাকতে পারছে না, ওই অবস্থাতেই নেমে পড়ল ঝুঁকি নিয়ে।

সন্তু দেখল, তাদের জানলা থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে হাতি দুটো দাঁড়িয়ে আছে। সন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানায় হাতি দেখেছে, আসামের জঙ্গলে বুনো হাতিও দেখেছে,

কিন্তু এই হাতিদের আকার যেন তাদের দ্বিগুণ। যেমন প্রকাণ্ড মাথা, তেমনই বড়-বড় দাঁত।

সন্তু বলল, আমরা নামতে গেলে যদি হাতি তেড়ে আসে?

কাকাবাবু বললেন, আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। বেশ রিস্কি ব্যাপার!

প্লেনটা থামাবার পর পাইলট আর কো-পাইলট বেরিয়ে এল দুটো রাইফেল হাতে নিয়ে। গম্ভীরভাবে গটগট করে পেছন দিকে গিয়ে দরজা খুলে তারা দমাস-দমাস করে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

মেমসাহেবটি দু কানে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল উ-ও-ও করে।

হাতি দুটোকে অবশ্য মেরে ফেলার জন্য গুলি চালানো হয়নি। মোট সাতটা গুলি ওপরের দিকে ছুঁড়ে খরচ করার পর তারা গজেন্দ্রগমনে পেছন ফিরে চলে গেল।

সন্তু ভাবল, বাপস, এইভাবে লোকে এদিকে বেড়াতে আসে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে পাইলটদের সঙ্গে আলাপ করলেন; ওরা একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ। দুজনেই বেশ আমুদে। প্লেনটি ওদের নিজস্ব কোম্পানির। প্রত্যেকদিনই এদিকে আসে, বিভিন্ন হোটেলের প্যাসেঞ্জার আনার জন্য ভাড়া খাটে।

কাকাবাবুর বগলে ক্রাচ দেখে শ্বেতাঙ্গটি বলল, তুমি কিন্তু এদিকে কখনও একলা–একলা বেরিও না। যখন-তখন সিংহের সামনে পড়ে যেতে পারে, তখন পালাতে পারবে না।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বলল, তুমি কি জাতে ব্রিটিশ? জানো না, ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে লড়াই করে আমরা ভারতের স্বাধীনতা পেয়েছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে কাকাবাবুর এমন ভাব হয়ে গেল যে, সে কাকাবাবুকে বিয়ার খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু হোটেলের লোকরা যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ দম্পতিটি আর সন্তু-কাকাবাবুকে তোলা হল একটা গাড়িতে। বুড়ো সাহেবটি অন্য একটি গাড়িতে রইলেন একা। এই গাড়িগুলো আলাদাভাবে তৈরি, মাটি থেকে অনেক উঁচু, দু পাশে বড়- বড় কাচের জানলা থাকলেও তার বাইরে লোহার রড দেওয়া, গাড়ির ছাদ ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায়।

অল্প-বয়েসি সাহেব-মেম দুটি নিজেদের মধ্যে গল্প করছে আর অনবরত হাসছে। ধুধু করা মাঠের মধ্য দিয়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তা, মাঝে-মাঝে বড়-বড় ঘাস, একদল হরিণ রাস্তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুটে চলে গেল। এক জায়গায় একটা বেশ লম্বা। আর ডালপালা-ছড়ানো গাছ দেখে কাকাবাবু বললেন, ওই দ্যাখ, ওটা বাওবাব গাছ।

সন্তুর মনে পড়ে গেল, বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়-এ সে এই গাছটার কথা পড়েছিল। সে গাছটাকে ভাল করে দেখতে যাচ্ছে, এমন সময় মেমসাহেবটি তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, হেই! লুক! লুক!

বাওবাব গাছের ছায়ায় বসে আছেন এক পশুরাজ। কেশর-ভরা মস্ত বড় মাথা, দুটি পা সামনের দিকে ছড়ানো, এই গাড়ির দিকে ঘুম-ঘুম চোখে একবার তাকালেন।

প্রথম দেখায় একবার বুকটা কেঁপে উঠল সন্তুর। এত কাছে একটা সিংহ। তারপর দেখল, একটা নয়, অনেকগুলো। পশুরাজ একলা বসে আছেন, খানিক দূরে এক দঙ্গল। তার মধ্যে দুটি সিংহী, পাঁচটা নানা বয়েসের বাচ্চা। বাচ্চাগুলো ঠিক বেড়ালছানার মতন এ-ওকে কামড়ে খেলা করছে!

সাহেব-মেম দুটি চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে!

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি গাড়ি স্লো করছি, আপনারা দেখুন, তবে অনুগ্রহ করে বেশি জোরে কথা বলবেন না।

গাড়ি থামল কি না-থামল তা গ্রাহ্যও করল না সিংহের দলটা। যেমন ছিল, তেমনিই রইল। ঠিক যেন মনে হয়, ওরা সপরিবারে বসে রোদ পোহাচ্ছে আর খেলা করছে, শুধু বাড়ির কতা একটু দূরে বসে আছেন।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চলবার পর থামল একটা গাছপালা-ঘেরা জায়গায়। ড্রাইভার নেমে পড়ে বলল, এবারে আপনাদের হেঁটে যেতে হবে। মালপত্র সব থাক, পরে অন্য লোক এসে নিয়ে যাবে, সেজন্য চিন্তা করবেন না। আসুন আমার সঙ্গে।

গাছপালার মধ্য দিয়ে একটা সরু রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। খানিকটা যেতেই একটা নদী চোখে পড়ল। বেশি চওড়া নয়। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা নাইলনের দড়ি টাঙানো, এপারে বাঁধা রয়েছে একটা খেয়া-নৌকো। এই নৌকো বাইতে হয় না, দড়ি ধরে-ধরেই ওপারে চলে যাওয়া যায়!

নদীর জল বেশ পরিষ্কার, স্রোত আছে। ড্রাইভারটি বলল, আপনারা এই নদীতে কেউ কখনও নামবার চেষ্টা করবেন না, এতে যথেষ্ট কুমির আছে। এই নৌকোতেও কক্ষনো একা পার হবার চেষ্টা করবেন না।

নদীর ওপারে আর-একটা খাড়াই সরু পথ। তারপর খানিকটা ঘন জঙ্গল। বোঝা গেল, নদীর ওই দিকটা পর্যন্ত গাড়ি চলে। এপারে দুজন লম্বা আফ্রিকান ছেলে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, বোধহয় গাড়ির আওয়াজ শুনে এসেছে। দুজনের হাতেই রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, প্লিজ ডোনট অ্যালোন গো টু ফরেস্ট। ভেরি ডেঞ্জার! গ্রুপ কাম, গ্রুপ গো। ফলে মি!

কয়েক পা যেতেই ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, শ্‌শ্‌শ্‌!

মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে দুটি দাঁতাল শুয়োর। রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের ডাল ধরে ঝুলছে কয়েকটা বেবুন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে সন্তুকে বললেন, হোটেলে পৌঁছবার আগেই তো অনেক রকম জানোয়ার দেখা হয়ে গেল রে!

কালো ছেলে দুটি হাতের রাইফেল তুলল না, কিছুই করল না, শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। তাতেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন একজন বলল, কাম স্লো, নো রান!

জঙ্গল একটু পাতলা হতেই সন্তু ভাবল, এইবার হোটেল-বিল্ডিংটা দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় বিল্ডিং। আর একটুখানি যেতে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড, হোটেল লিটল ভাইসরয়। তার ওপাশে খানিকটা ব্যবধানে দুটো তাঁবু, একটা বেশ বড়, আর-একটা মাঝারি, সেটার গায়ে লেখা আছে অফিস। এই নাকি হোটেল? এ কী হোটেলের ছিরি! তবে যে অশোক দেশাই বলেছিলেন বিরাট হোটেল?

ওরা সেই অফিস-তাঁবুর কাছে আসতেই একজন বেশ স্মার্ট চেহারার কালো যুবক বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, ওয়েলকাম! ওয়েলকাম! আজকের দিনটা খুব সুন্দর, তাই না? দেখুন বৃষ্টি নেই, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, আপনারা সুন্দরভাবে বেড়াতে পারবেন। আগে খাতায় আপনাদের সবার নাম-ঠিকানা লিখুন, তারপর আমি আপনাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি!

কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে এসে যুবকটি বলল, আশা করি আপনিই মিঃ রায়চৌধুরি? কাল রাত্তিরেই আপনাদের আসার খবর পেয়েছি। আমি চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে থাকি। আপনার যখন যা দরকার হয়, আমাকে বলবেন।

খাতায় নাম-টাম লেখা হয়ে যাবার পর সেই ম্যানেজার সবাইকে নিয়ে সামনের দিকে এগোল। দেখা গেল, ওই বড় তাঁবুটা হল খাবার ঘর। তারপর ডান পাশে একটা জলাভূমি,

বা দিকে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা দূরে দূরে ছড়ানো আরও অনেক তাঁবু, অন্তত গোটা চল্লিশেক তো হবেই।

এই তাঁবুগুলোই হোটেল-ঘর। সবুজ তাঁবুগুলো জঙ্গলের মধ্যে মিশে আছে, তাই জঙ্গলের সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। এখানে একটা সিমেন্ট-কংক্রিটের মস্ত বড় বাড়ি থাকলে বিচ্ছিরি দেখাত।

ডান পাশের জলাভূমিতে জল বেশি নেই, মাঝে-মাঝে ঘাস গজিয়েছে, সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো মোষ। মাঝখানে একটা দ্বীপের মতন জায়গায় একঝাঁক বেবুন ও বুনো শুয়োর, বেশ খানিকটা দূরে আবছা-আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা হাতি।

ম্যানেজারটি বলল, আপনারা কেউ এই জলাভূমিতে নামবেন না। যে-কোনও জন্তু যখন-তখন এখানে এসে পড়তে পারে, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। সব জন্তুরই নিজস্ব খাদ্য এখানে প্রচুর আছে, সেইজন্য মানুষ ওদের ক্ষতি না করলে ওরাও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। তবে, একটা ব্যাপারে খুব সাবধান, ওই যে মোষগুলো দেখছেন, আপাতত নিরীহ মনে হলেও ওরাই আফ্রিকার সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। ওদের কাছাকাছি খবরদার যাবেন না। ওরা অত্যন্ত বদরাগী, একমাত্র ওরাই বিনা কারণে মানুষ সামনে দেখলে টুসিয়ে পেট ফুটো করে দেয়। ওরা দল বেঁধে থাকলে সিংহ কাছে ঘেঁষে না।

সন্তু শুনে অবাক হল। মোষগুলোকে তো আমাদের দেশের মোষের মতনই দেখতে প্রায়। তবে, এদের পায়ের কাছে একটু সাদা ছোপ, মনে হয় যেন সাদা মোজা পরা। জলাভূমি ছেড়ে এই মোষগুলো যদি তাঁবুর কাছে চলে আসে?

অধিকাংশ তাঁবুই খালি। একটি-দুটি লোককে মাত্র দেখা গেল। সন্তুদের দেওয়া হল ৩৪ নম্বর তাঁবু, তার পেছন দিকটায় বাঁশবন, ডান পাশে, বাঁ পাশেও এমন ঝোপঝাড় যে, সেখান থেকে অন্য কোনও তাঁবু দেখতে পাওয়া যায় না।

ম্যানেজার বলল, আপনারা একটু বিশ্রাম নিন, আপনাদের মালপত্র এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছে। সাড়ে বারোটার সময় লাঞ্চ দেওয়া হবে, প্রথম যে বড় তাঁবুটা দেখেছিলেন, সেখানে চলে আসবেন।

এই তাঁবু সাধারণ তাঁবু নয়, স্পেশালভাবে তৈরি। নাইলনের তৈরি এমন পুরু বনাত যে ছুরি দিয়েও কাটা যাবে না। ব্যবস্থা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন, বাঃ! এরকম আশাই করিনি।

তাঁবুর সামনেটায় একটা ছোট বারান্দায় বসবার জায়গা, সেখানে রয়েছে তিন-চারটে চেয়ার আর একটা নিচু টেবিল। তারপর ভেতরে ঢোকার দরজা। মাঝখানের একটা জিপার টেনে খুললেই দরজার দুটো পাল্লা হয়ে যায়। ভেতরে দু পাশে দুটি খাট পাতা, তাতে ধপধপে সাদা বিছানা। ঠিক যেন কোনও ভাল হোটেলের ডাবল-বেড রুম। শিয়রের কাছে ছোট টেবিল, তার ওপরে বাইবেল ও কয়েকটা পত্রপত্রিকা, এমনকী দেওয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও টাঙানো আছে। দুদিকে দুটি দুটি জানলা, তাতে তারের জাল। পেছন দিকে আবার জিপার টেনে দরজা খুললে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তারপর আর-একটা ছোট তাঁবু। সেটা বাথরুম। সেই বাথরুমের ব্যবস্থা দেখলে হকচাকিয়ে যেতে হয়। তাতে কমোড আছে, শাওয়ার আছে, বেসিন আছে। সেই বেসিনের দুটো কল, সন্তু খুলে দেখল, একটা দিয়ে ঠাণ্ডা আর-একটা দিয়ে গরম জল বেরোচ্ছে! সবা-কিছু একেবারে নিখুঁত আর ঝকঝকে পরিষ্কার!

ওরা দুজনে সামনের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। যদিও ঝকঝকে রোদ উঠেছে, তবু গরম নেই। প্রথম দশ-পনেরো মিনিট ওরা চুপ করে বসে রইল। সামনের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জলাভূমিতে নানা রকম প্রাণী আসছে, চলে যাচ্ছে, একদল হরিণ খেলছে। আপনমনে, কিছু মানুষ যে ওদের দেখছে সেদিকে ওদের হুঁশই নেই। এই প্রথম সন্তু জিরাফ দেখতে পেল। এক জোড়া জিরাফ নাচের ভঙ্গিতে আস্তে-আস্তে ছুটে এসে আবার জলাভূমির ডান পাশের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কাছাকাছি কী যেন একটা পাখি শিস দিচ্ছে, পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, এখানে বসে-বসেই তো সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় রে

সন্তু বলল, এখনও আমার চোখকে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!

কাকাবাবু বললেন, এখানে যারা বেড়াতে আসে, তাদের পয়সা খরচ সার্থক হয়ে যায়। কিন্তু হোটেলটা তো সত্যি চলছে না দেখছি। এতগুলো তাঁবু। খালি! এত বড় হোটেল যখন বানিয়েছে, তখন এক সময় নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আসত।

হঠাৎ ফ-র-র ফ-র-র শব্দ শুনে সন্তু চমকে উঠল। তাঁবুর খুব কাছেই একটা জেব্রা এসে নিশ্বাস ফেলছে। এই জেব্রাট পেছনের বাঁশবনের দিক থেকে এসেছে। দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে অবাক চোখ মেলে সে এই মানুষ দুটিকে দেখছে।

এত কাছ থেকে সন্তু কখনও জেব্রা দ্যাখেনি। তার গায়ের চামড়া কী মসৃণ, ঠিক সিল্কের মতন। সাদা শরীরে কালো ডোরাগুলো যেন কোনও শিল্পীর আকা। মুখখানা কচি বাচ্চাদের মতন সরল।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাকাবাবু, ওর গায়ে একটু হাত ঝুলিয়ে দেব?

কাকাবাবু বললেন, জেব্রাগুলো তো এমনিতে খুব শান্ত হয় শুনেছি। তবে লাথি-টাথি ছেড়ে কি না তা জানি না। চেষ্টা করে দ্যাখ।

সন্তু বারান্দা থেকে নামতেই জেব্রাটা বিদ্যুৎ-গতিতে পেছন ফিরে পোঁপোঁ করে ছুট লাগাল।

এই সময় একটি আফ্রিকান ছেলে এল ওদের সুটকেস দুটো বয়ে নিয়ে। সে-দুটো বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, ইউ নিড এনিথিং স্যার? টি, কফি, বিয়ার, ফুটস? নে? কোকাকোলা, সেভেন আপ? নোঃ? স্যান্ডউইচ, হ্যাম, সসেজ, পেস্ট্রি?

কাকাবাবু বললেন, নো, থ্যাংক ইউ। সাড়ে বারোটা বাজতে আর আধঘণ্টা দেরি আছে, তখন আমরা লাঞ্চ খেতে যাব।

লোকটি নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এই মরুভূমি আর জঙ্গলের মধ্যেও কত রকম জিনিস পাওয়া যায় দেখলি? আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি নেই। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, নদীর ধার থেকে যে-ছেলে দুটি বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল, তাদের সঙ্গে এই লোকটার চেহারার অনেক তফাত। এই লোকটা বেঁটে, ওরা দুজন খুব লম্বা। এখানে তো অনেক উপজাতি আছে, তাদের ভাষা আলাদা, চেহারাও আলাদা, গায়ের রংও দেখবি সবার সমান কালো নয়। ওই লম্বা ছেলে দুটো খুব সম্ভবত মোসই। এই মাসাইরা খুব সাহসী যোদ্ধা হয়। আর খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।

সন্তু বলল, ও, তা হলে এই উপজাতিদের নামেই জায়গাটির নাম মাসাইমারা? মারা মানে কী?

তা আমি জানি না। তবে মারা নামে এদিকে একটা নদী আছে।

এই সময় একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ আস্তে-আস্তে হেঁটে এসে এই তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, গুড মর্নিং! তোমরা বুঝি আজকেই এলে?

কাকাবাবু বললেন, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, আমরা নতুন এসেছি। আপনি কতদিন আছেন?

লোকটি একটু কাছে এসে বলল, আমি এসেছি.প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল, আরও কিছুদিন থাকব।

কাকাবাবু লোকটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। লোকটির নাম গুনার ওলেন, জাতে সুইডিশ। তিনি একজন নাট্যকার। নিরিবিলিতে এখানে একটি নতুন নাটক লিখতে এসেছেন। দু বছর

আগে তিনি এখানে আর-একবার এসেছিলেন, সেবার যে নাটকটি লিখেছিলেন, সেটি সুইডেনে খুব জনপ্রিয় হয়েছে, ইংরেজিতেও অনুবাদ বেরিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, আপনাদের দেশের ইংগামার বার্গম্যানের অনেকগুলো ফিল্ম আমি দেখেছি, আমার খুব ভাল লেগেছে।

গুনার ওলেন হেসে বললেন, আমার সঙ্গে কোনও বিদেশির দেখা হলে ওই নামটাই সবাই বলে। হ্যাঁ, ইংগামার এখন আমাদের দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। আপনারা কি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ।

বেড়াতে!

হ্যাঁ, বেড়াতেই। আমি আপনার মতন লেখক নই। আপনি তো দুবছর আগে এখানে এসেছিলেন বললেন। তখনকার থেকে এখন কোনও তফাত দেখছেন?

জায়গাটা একই রকম আছে। তবে দুবছর আগে এই হোটেলটা ভর্তি দেখেছি। লোকজনে জমজমাট ছিল। এবার তো প্রায় ফাঁকা। গতকাল পর্যন্ত সাতজন ছিল মাত্র, তার মধ্যে পাঁচজন চলে গেল। আজ। আপনারা কজন এলেন? কম লোক এলে হোটেলের ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ভাল। আমি নির্জনতা পছন্দ করি।

আচ্ছা, মিঃ ওলেন, আমরা তো নতুন এসেছি, আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জেনে নিই। এখানে কোনও ভয়-টয় নেই তো? এই যে এত জন্তু-জানোয়ার কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে কোনও হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করতে পারে না?

একটা কথা মনে রাখবেন, মিঃ রায়চৌধুরী। প্রকৃতির জগতে আপনি যদি কারও ক্ষতি না করেন, তা হলে অন্য কেউ সহজে আপনার ক্ষতি করতে চাইবে না! এক রাত্তিরে আমি একটা হাতির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভয় পাইনি। আমি জানি, মানুষ

তো হাতির খাদ্য নয়। সে শুধু শুধু আমাকে মারবে কেন? আমি হাতিটাকে নমস্কার করলুম, সে অন্যদিকে চলে গেল!

বাঃ, এ যে প্রায় গল্পের মতন।

গল্প নয়। সত্যি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

নাইরোবিতে থাকার সময় আমরা একটা গুজব শুনেছিলাম, দুজন বিদেশি টুরিস্ট নাকি এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেটা বোধহয় গুজবই, তাই না?

এই কথাটা আমিও শুনেছি। আমি বিশ্বাসও করিনি, অবিশ্বাসও করিনি। দুজন জার্মান যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তারা নিশ্চয়ই নিজেরা ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছে। এক-এক সময় আমারই তো ইচ্ছে করে, হাঁটতে-হাঁটতে দিগন্তে মিলিয়ে যাই।

এই হোটেলে হঠাৎ টুরিস্ট কম আসছে কেন বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?

আমার কিছু মনে হয় না। যত কম লোক আসে, ততই ভাল! বেশি লোক এসে জঙ্গলের মধ্যে হইচই করে, সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।

তা অবশ্য আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ ওলেন!

আপনার নাম কী যেন বললেন? মিঃ রোয়া, রোয়া, চুডরি?

রায়চৌধুরী। তবে শুধু রায় বা রোয় বললেও ক্ষতি নেই।

গুনার ওলেন সন্তুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর কাকাবাবুকে বললেন, মিঃ রোয়চৌডারি, আপনি যে জঙ্গল দেখবেন, তা এই কিশোরটির চোখ দিয়ে দেখুন। এই বয়েসটাই সবকিছু দুচোখ ভরে দেখতে জানে। আমি জন্মেছি সুইডেনের একটা দ্বীপে।

সেখানে প্রচুর জঙ্গল ছিল। এখন আমি পৃথিবীর যে-কোনও জঙ্গলে বেড়াতে গেলেই আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

এই সময় ঝুনঝুন করে একটা বেল বেজে উঠল। বেশ খানিকটা দূরে। খুব সম্ভবত অফিস-তাঁবুর কাছ থেকে।

কাকাবাবু বললেন, ওই বোধহয় খাবার ঘণ্টা বাজছে।

গুনার ওলেন হেসে বললেন, না, এটা সে-ঘণ্টা নয়। এটা হাতি আসার ঘণ্টা। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনও হাতির পাল এসে পড়েছে। তখন ঘণ্টা বাজিয়ে এরা আমাদের তাঁবুর বাইরে যেতে নিষেধ করে।

কাকাবাবু বললেন, সে কী, এই সব তাঁবুর কাছেও হাতি আসে নাকি?

গুনার ওলেন বললেন, এরা যখন খুশি আসবে, সেইটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। তবে, চিন্তার কিছু নেই। আফ্রিকার হাতি মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ দেখলে তারাই অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে সরে যায়।

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বুঝি হাতিগুলোকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে? চলো না, এগিয়ে দেখা যাক।

গুনার ওলেন সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে জলাভূমির কাছে চলে গেলেন। কাকাবাবু কোটের পকেটে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন। কী যেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি চুরুট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু এখনও উত্তেজনার মুহূর্তে চুরুটের জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করে।

চুরুট না খেলেও কাকাবাবু পকেটে সবসময় একটা লাইটার রাখেন। অনেক সময় ওটা অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগে। সেই লাইটারটা বার করে তিনি আপনমনে জ্বালাতে লাগলেন।

সন্তুরা অবশ্য হাতির পালটা দেখতে পেল না। দুরের জঙ্গলে হোটেলের কর্মীরা পটকা ফাটাচ্ছে, সেই ধোঁয়া উড়ছে।

একটু বাদে অল ক্লিয়ার ঘণ্টা বাজল। ওরা এবার খেতে গেল বড় তাঁবুটার দিকে।

সুন্দর রোদ-ঝিকিমিকি দিন বলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বাইরে। অনেকগুলো টেবিল এনে পাতা হয়েছে। ওপেন এয়ারে বুফো লাঞ্চ। অনেক রকমের খাবার, যে যত খুশি খেতে পারে। সন্তু গুনে দেখল, খেতে বসেছে ওরা মাত্র আটজন। আর হোটেলের এগারোজন কর্মচারী ওদের দেখাশোনা করছে। কী করুণ অবস্থা এই হোটেলের।

যে সাহেব-মেম দম্পতিটি ওদের সঙ্গে একই প্লেসে এসেছিল, তাদের সঙ্গে আলাপ হল। ওরা আমেরিকান, বিয়ে করার পর বেড়াতে এসেছে। কিছুদিন আগে যে এই হোটেল থেকে দুজন টুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে-কথা ওরা জানে না।

আর একটা প্রৌঢ় দম্পতি এখানে রয়েছেন, দিন-পাঁচেক ধরে। কাকাবাবু তাঁদের সঙ্গেও যেচে আলাপ করলেন। সেই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারাও এই হোটেল সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই। এঁরা জাতিতে পর্তুগিজ, স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর সারা পৃথিবীতে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজতে বেরিয়েছেন। দুজনেই বেশ মজার কথা বলেন।

সন্তুদের সঙ্গে একই প্লেনে আর একজন যে বুড়ো সাহেব এসেছিলেন, তিনি খেতে বসলেন একা একটি টেবিলে। অন্য কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি উঠে উঠে নিজের খাবারও নিতে যাচ্ছেন না, হোটেলের কর্মচারীরা তাঁর খাবার এনে দিচ্ছে। ইনি একটু করে খাচ্ছেন আর অনেকক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়ে থাকছেন জলাভূমির দিকে।

হোটেলের ম্যানেজারটি এসে ঘোষণা করল, খাওয়া-দাওয়া শেষ করার আধঘণ্টা পরেই সবাইকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। নদীর ওপারে গাড়ি তৈরি আছে।

খাওয়া শেষ করে কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে গিয়ে সেই বুড়ো সাহেবের টেবিলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্তু একটা বায়নোকুলার এনেছে, সেটা দিয়ে সে জলাভূমির দূরের জানোয়ারগুলোকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে। একটা জিনিস সে লক্ষ করেছে। এখানে কোনও কুকুর নেই। খোলা জায়গায় খেতে বসলে দু-একটা কুকুর এসে সামনে ঘুরঘুর করবে, এটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়। গুনার ওলেন। অবশ্য সন্তুকে বলেছিলেন যে, এখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে ওয়াইল্ড ডগস আছে, তারা এমনই হিংস্র যে, মোষ কিংবা সিংহরাও তাদের ভয় পায়।

বুড়ো সাহেবটি একবার চোখ তুলতেই কাকাবাবু বললেন, শুভ দ্বিপ্রহর। এখানে রোদ বেশ চড়া, কিন্তু হাওয়াটা ঠাণ্ডা, এটা বেশ চমৎকার, তাই না?

লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ!

কাকাবাবু আবার বললেন, আপনার তো দেখছি এখনও কফি খাওয়া হয়নি, আমি আপনার টেবিলে বসে আর-এক কাপ কফি পান করতে পারি কি?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

সন্তুর চোখে যদিও দূরবীন তবু সে কান খাড়া করে সব কথা শুনছে। সে আগে কখনও কাকাবাবুকে এরকম সোধে-সেধে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে দ্যাখেনি।

সেই বৃদ্ধটির টেবিলে বসে কাকাবাবু বললেন, অতি সুন্দর জায়গা। ইচ্ছে করে এখানে অনেকদিন থেকে যেতে।

বৃদ্ধটি শুকনো গলায় বললেন, আপনার ভাল লাগছে। এ-জায়গাটা? শুনে সুখী হলাম।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেন, আপনার এ জায়গাটা ভাল লাগছে না?

বৃদ্ধটি বললেন, ভাল লাগালাগির তো প্রশ্ন নয়। আমি প্রত্যেক বছর অন্তত ছমাস করে এখানে থাকি।

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, আপনি প্রতি বছরে ছ। মাস...তার মানে কত বছর ধরে এখানে আসছেন?

তা প্রায় পনেরো বছর হবে? পনেরো বছর? অর্থাৎ এই জায়গাটি আপনি এত ভালবাসেন যে, প্রতি বছর আপনাকে আসতেই হয়?

এই জায়গাটা যে আমার খুব ভাল লাগে, তা আমি বলতে পারব না। মাঝে-মাঝে বেশ খারাপ লাগে, একঘেয়ে লাগে, তবু আমাকে আসতেই হয়।

খারাপ লাগে, একঘেয়ে লাগে, তবু আসতে হয়? ঠিক বুঝলাম না। তার মানে কি এই যে, মাসাইমারা আপনাকে চুম্বকের মতন টানে? আপনি না এসে পারেন না?

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, চুম্বকের টানের ব্যাপার নয়। আমাকে আসতে হয় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আমার নাম পিয়ের লাফার্গ। আমি এই হোটেলটার মালিক?

৫. মাসাইমারার রাত্তির

মাসাইমারার রাত্তির যে এত লম্বা হবে, সে সম্পর্কে কাকাবাবুরও কোনও ধারণা ছিল না।

সূর্যের আলো ফুরিয়ে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে আর বেরোনো নিষেধ। তখন বাজে মাত্র আটটা।

রাত্তিরের ডিনার দেওয়া হয়েছিল বড় তাঁবুটার মধ্যে। তারপর প্রত্যেক তাঁবুর অধিবাসীদের এক-একজন মাসাইগার্ড সঙ্গে দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ফেরার সময় সন্তুদের একটা সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।

সন্ধে হতে না হতেই চতুর্দিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। এই হোটেলে এত সব আধুনিক ব্যবস্থা থাকলেও ইচ্ছে করেই বোধহয় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রত্যেক তাঁবুর মধ্যে রয়েছে বেঁটে-বেঁটে হ্যাজাক-বাতি। আর তাঁবুর বাইরে অন্ধকারের রাজত্ব। আর এই অন্ধকারের মধ্যে বণ্যপ্রাণীরা গিসগিস করছে, এ-কথা ভাবলেই গা ছমছম করে।

যে-মাসাই গার্ডটি সন্তুদের পৌঁছে দিতে এসেছিল, তার হাতে ছিল একটা বর্শা আর একটা শক্তিশালী টর্চ। তার নাম এমবো। কাকাবাবু তার সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সে মাত্র পনেরো-ষোলোটার বেশি ইংরেজি শব্দ জানে না। তা ছাড়া তার স্বভাবটাও গম্ভীর ধরনের।

সে আগে-আগে টর্চের আলো ফেলো-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় সে চাপা গলায় বলে উঠল, স্টপ!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা ফাঁকা তাঁবুর পাশে দু-একটি কালো রঙের কী যেন জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

মাসাইগার্ডটি আবার বলল, বাফেলো! ভেরি ব্যান্ড।

বাফেলো শুনেই সন্তুর বুক কেঁপে উঠল। এত কাছে মোষ? সকালেই ম্যানেজার বলে দিয়েছিল, এই মোষগুলো হঠাৎ রেগে গিয়ে পেট ফুটো করে দেয়!

মাসাই-গার্ডটি টর্চের আলো নাচাতে লাগল। জন্তুগুলোর ওপরে। অরণ্যের কোনও প্রাণীই আলো পছন্দ করে না। আলো দেখলে তারা চলে যাবে। কিন্তু মোষ কি এত বড় হয়? এ যে ছোটখাটো পাহাড়ের মতন দেখাচ্ছে। হাতি নাকি?

একটা জন্তু মুখ ফেরাতেই মাসাইগার্ডটি আবার বলল, হিপো।

তারপর সে নিজের ভাষায় কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

জলহস্তী? খাওয়ার টেবিলে গুনার ওলেন নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব সম্পর্কে গল্প শোনাচ্ছিলেন। জলহস্তী সম্পর্কে বলেছিলেন, ওরা সারাদিন জলে ডুবে থাকে শুধু নাকটা উঁচু করে। সহজে দেখাই যায় না। কিন্তু সন্ধে হলেই ওরা জল থেকে উঠে আসে, যেখানে-সেখানে ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। জলহস্তী এমনিতে নিরীহ আর বোকা প্রাণী। কিন্তু সামনা-সামনি মানুষ পড়ে গেলে ওরা ছেলেমানুষি করে কামড়ে দেয়। ওদের হা-টা এত প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে একসঙ্গে দুটো মানুষ ঢুকে যেতে পারে। ওরা মানুষের মাংস খায় না। মানুষকে কামড়ে তার শরীরটা দু টুকরো করে ফেলে দেয়।

কাকাবাবু সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, ভয় নেই।

টর্চের আলোয় জলহস্তীর চোখকে মনে হয় আগুনের ভাঁটা।

মাসাইগার্ডটি ধমকের সুরে বলল, ইউ, টর্চ! ইউ, টর্চ!

সন্তু আর কাকাবাবুর পকেটেও টর্চ রয়েছে।. গার্ডটি ওদেরও টর্চ জ্বালাতে বলছে। এক সঙ্গে তিনটে টর্চের আলো পড়তেই জলহস্তী দুটো দৌড়ে গিয়ে নেমে পড়ল জলাভূমিতে।

কয়েক টন ওজনের ওই জানোয়ারের কিন্তু ছোটার কোনও শব্দ নেই, শুধু জলে নামার সময় মনে হল, সেখানে কোনও পাহাড়ের চাই ভেঙে পড়ছে।

এরপর সন্তু আর কাকাবাবু দ্রুত নিজেদের তাঁবুতে পৌঁছতে মাসাইগার্ডটি বলেছিল, নো কাম আউট অ্যাট নাইট! গুড নাইট!

শীতের মধ্যেও সন্তুর সারা শরীর ঘেমে গেছে। কাকাবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, বোকা জানোয়ার দুটো যদি ভুল করে আমাদের দিকেই ছুটে আসত, তা হলে ওদের পায়ের চাপেই পিষে যেতাম!

সন্তু জুতোটুতো না খুলেই ঝপাস করে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়।

কাকাবাবু বললেন, মাত্র আটটা বাজে, এর মধ্যেই শুয়ে পড়ব! বাকি রাতটা কাটবে কী করে?

গুনার ওলেন বলেছেন, এটাই এখানকার নিয়ম। রাত্তিরবেলা বাইরে বেরুনো কোনওক্রমেই উচিত নয়। তাঁবুর মধ্যে থাকলে অবশ্য কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। সে-রকম কোনও ঘটনা এখানে ঘটেনি। সারা রাত বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলিয়ে রেখে মাসাইগার্ডরা পাহারা দেয়। সিংহ, নেকড়ে, চিতা, হায়েনার মতন হিংস্র প্রাণীরা আগুন দেখলে সেদিকে আসে না, তবে হরিণ, জেব্রা, শুয়োর, ওয়াইল্ড বিস্ট- এর মতন যে-সব প্রাণীরা দল বেঁধে দৌড়ীয়, তারা অনেক সময় এসে পড়ে, তাদের সামনে পড়ে গেলেও মুশকিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, একপাল জেব্রা কিংবা হাতি-টাতিরা তাঁবু ভেঙে দিতে পারে না?

গুনার ওনেল উত্তর দিয়েছিলেন, জীবজন্তুদেরও তো মনস্তত্ত্ব আছে। সে-সব স্টাডি করা হয়েছে। অকারণে ওরা তাঁবু ভাঙতে যাবে কেন?

ওদের যাওয়া-আসার পথে যদি পড়ে?

ওদের যাওয়া-আসার নির্দিষ্ট পথ আছে। হাতিরা তো ধরাবাঁধা পথ ছাড়া কক্ষনো অন্য পথে যায় না। তবু দু-চারটে জানোয়ার যদি ছিটকে এসে পড়ে, তারাও তাঁবু এড়িয়ে চলে। তাঁবুর চার পাশে যে দড়ি আছে, সেগুলো পায়ে লাগলে ওরা বিরক্ত হয়। এই দড়িগুলো এত শক্ত যে, সহজে ছেড়ে না! আমার তো এখানে রাত্তিরে বেশ ভাল ঘুম হয়?

কিন্তু ওই জলহস্তী দুটো দেখার পর থেকে গুনার ওলেনের কথায় বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। ওই বোকা জলহস্তীরা যদি ভুল করেও তাঁবুর ওপরে একখানা পা রাখে তা হলেই তো সব কিছু চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে!

কাকাবাবুর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা অভ্যোস। তিনি বললেন, এ তো মহা মুশকিল, রাত্তিরে বাইরে বেরুনো যাবে না, এরকম জায়গায় আমি আগে কখনও থাকিনি।

সন্তুও কোনওদিন আটটায় ঘুমোয় না। সে একটু পরে জুতোটুতো খুলে একখানা বই পড়বার চেষ্টা করল। বইটা আগে থেকে এখানে রাখা ছিল। সেটার নাম দ্য হিউম্যান জু। হ্যাজাকের আলোয় খুব ভাল পড়া যায় না।

কাকাবাবুও একখানা বই খুললেন। তারপর আপন মনে বললেন, দিনের বেলা এ-জায়গাটা খুব ভাল, কিন্তু রাত্তিরে যে একবোরে বন্দীদের মতন অবস্থা?

খানিক বাদে তাঁবুর বাইরে থেকে কে যেন অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, মিঃ রায়চৌধুরী!

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে কাকাবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজা খুললেন।

হোটেলের সেই কালো ম্যানেজার। হাতে একটা টর্চ। সে বলল, আপনি এত তাড়াতাড়ি ঘুমোন না। আশা করি। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।

কাকাবাবু বললেন, আসুন, আসুন! না, ঘুমোবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে একলা এলেন?

জন্তু-জানোয়ারের মুখের সামনে পড়ে গেছি। আমার কিছু হয়নি।

সন্তুও উঠে বসিল। ম্যানেজারটি সন্তুর বিছানার এক ধারে বসে বলল, প্রথম রাতটায় অনেকেরই এখানে ঘুম হয় না। কাল দিনের বেলা ঘুমিয়ে নেবেন?

ম্যানেজারের নাম ফিলিপ কিকুইউ, পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, বেশ গড়গড় করে ইংরেজি বলে। কয়েকটা ভারতীয় শব্দও জানে, যেমন নমস্তে, ধন্যবাদ, রুপিয়া, বিদেশি।

ওর নাম শুনে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিকুইউ? তার মানে জেমো কেনিয়াটার জাতের লোক?

ফিলিপ সগর্বে বলল, হ্যাঁ, আমরাই এ-দেশের উঁহুরু মানে স্বাধীনতা এনেছি। তুমি জেমো কেনিয়াটা সম্পর্কে জানো?

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, জেমো কেনিয়াটা ছিলেন। এখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, এ-দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকদিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

ফিলিপ বলল, আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছি। বোম্বাইতে এক বছর ছিলাম। তারপর ইংল্যান্ডে পড়েছি চার বছর।

কাকাবাবু বললেন, তুমি তো বেশ বিদ্বান দেখছি। তা হলে এই জঙ্গলে পড়ে আছ কেন?

ফিলিপ দু আঙুলে তুড়ি দিয়ে বলল, মানি! মানি! আমার অনেক টাকা চাই। এই হোটেলের মালিকরা আমাকে ভাল টাকা দেয়। অনেক টাকা রোজগার করে একদিন আমি নিজেই এরকম একটা হোটেল খুলব। এ-দেশে হোটেলের ব্যবসায়ে খুব লাভ।

কিন্তু এখন তো এই হোটেলটা ভাল চলছে না দেখছি!

হ্যাঁ, একটা বদনাম রটেছে। কিছুদিন বাদেই কেটে যাবে। লোকে ভুলে যাবে।

হঠাৎ বাইরে হুড়মুড় শব্দ হল। কয়েকটা বড় জন্তু ছুটে গেল যেন জানলার সামনে দিয়ে। সন্তু চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠতেই ফিলিপ তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, ভয় নেই, ও একটা ইল্যাণ্ড! এরকম শব্দ সারা রাত শুনতে পাবে। ওই জন্যই তো বললাম, প্রথম রাতে ঘুম হবে না?

সন্তু জিজ্ঞেস করলে, ইলাণ্ড কী?

তোমরা ইল্যাণ্ড দ্যাখোনি? ইলাণ্ডও এক জাতের হরিণ বলতে পারো, তবে এক-একটা প্রায় ঘোড়ার চেয়েও বড় হয়, মারলে সাতশো-আটশো কেজি মাংস পাওয়া যায়।

কী করে বুঝলেন ওটা ইল্যাণ্ড? যদি জলহস্তী হয়?

আমি সব জন্তুর পায়ের আওয়াজ চিনি।

কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলেন। আকাশে চাঁদ নেই, বাইরেটা ঘুটফুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তবে খানিক দূরে কোনও প্রাণীর নিশ্বাসের ফোঁসফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ল, একসঙ্গে অনেক জন্তুর নিশ্বাস।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওগুলো কী?

ফিলিপ বলল, ওই যে ফোঁসফোঁস করছে? ওরা হচ্ছে এই জঙ্গলের সবচেয়ে নিরীহ আর বোকা প্রাণী। ওয়াইল্ড বিস্ট! মুখখানা মোষের মতন, কিন্তু ঘাড়টা লম্বা, তাতে আবার ঘোড়ার মতন কেশর, পেছন দিকটা আবার হরিণের মতন। এক কিম্ভূতকিমাকার জন্তু।

সন্তু বলল, হ্যাঁ, দিনের বেলা দেখেছি।

ফিলিপ বলল, কাল গাড়ি নিয়ে বেরোলে দেখতে পাবে হাজার-হাজার। লক্ষ-লক্ষও বলতে পারো। এই সময় ওরা টানজানিয়া থেকে দল বেঁধে এদিকে আসে, একটা দলের থেকে পঞ্চাশ-একশোটাকে মেরে ফেললেও কিছু এসে যায় না। ওদের মাংস কিন্তু খুব সুস্বাদু!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওদের মারা হয় নাকি?

ফিলিপ বলল, না, না, জন্তু মারা তো এ-দেশে নিষেধ। মাসাইরা লুকিয়েচুরিয়ে মারে। আর সিংহতে মারে। ওয়াইল্ড বিস্ট সিংহদের খুব প্রিয় খাদ্য। শুধু পেটের অংশটা খেয়ে বাকিটা ফেলে দেয়। সেই বাকি অংশ হয়েনারা খায়।

এখান থেকে যে দুজন টুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, তুমি তাদের দেখেছিলে?

হ্যাঁ, দেখব না কেন? এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমি তখন ছিলাম এখানে।

তোমার কী ধারণা? তারা কী করে হারিয়ে গেল?

ওদের হারিয়ে যাবার একটাই কারণ থাকতে পারে। ওরা রাত্তিরে বেরিয়েছিল। অনেকে তো বেশি-বেশি সাহস দেখাতে চায়। রাত্তিরবেলা পায়ে হেঁটে ঘুরতে গিয়ে যদি এক পাল ওয়াইল্ড ডগের সামনে পড়ে, তা হলে আর চিন্তা নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বুনো কুকুররা কি জামাকাপড়ও খেয়ে ফেলবে?

আশ্চর্য কিছু না। ওরা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে একটা বড় মোষকে পর্যন্ত শেষ করে দিতে পারে। কিছুই পড়ে থাকে না।

পুলিশ এই থিয়োরি মেনে নিয়েছে?

আর উপায়ই বা কী? কিছুই যখন পাওয়া গেল না, আমরাও তো অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি।

আচ্ছা, সেই টুরিস্ট দুজন একসঙ্গে এসেছিল, না আলাদা-আলাদা? ওদের সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে? ওরা মানুষ কেমন ছিল?

ওরা আলাদা এসেছিল। এখানে দু-তিনদিন থাকার পর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এমনিতে বেশ ভালই লোক ছিল, হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ, বেশির ভাগ টুরিস্ট যেমন হয়। একজন ছিল গায়ক, আর একজন অধ্যাপক। জানো তো, একটা গুজব আছে, এখানকার মাঠেঘাটে নাকি হঠাৎ হিরে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই হিরের খোঁজেই ওরা রাত্তিরবেলা বেরিয়েছিল কি না কে জানে?

সত্যি এখানে হিরে পাওয়া যায়?

না, ওটা একেবারেই গুজব। হিরের খনি আছে সাউথ আফ্রিকায়, এখান থেকে অনেক দূরে।

আচ্ছা, আর-একটা কথা শুনেছিলাম। রাত্তিরবেলা এখানে তাঁবুর মধ্যে থাকলেও নাকি কী রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। ঘুম আসতে চায় না!

সে ওই জন্তু-জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ আর নিশ্বাসের শব্দ তো সারারাত ধরে লেগেই থাকে। সেই জন্য অনেকের ঘুম হয় না।

শুধু ওই? আর কোনও কারণ নেই?

না, আর কী থাকবে?

অনেক টুরিস্ট নাকি ওই জন্য দু-একদিন থেকেই ফিরে যাচ্ছে। সাধারণত এখানে দু-একদিন থাকার জন্যই লোকে আসে। রাত্তিরে ওইসব শব্দ অনেকেরই সহ্য হয় না। অন্যান্য দেশে লোকে সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে একটা-আধটা জন্তু দেখতে পায় কিংবা একটাও পায় না। তোমাদের ইন্ডিয়ার একটা জঙ্গলে আমি বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম, গাড়ি

নিয়ে, স্পট-লাইট জেলে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরেও বাঘ দেখতে পাইনি। একটাও না। আর আফ্রিকায় তুমি এইসব জায়গায় এসে প্রথম দিনেই এত জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবে যে, দু দিনেই তোমার জন্তু দেখার শখ মিটে যাবে। তোমরা এখনও কী কী জন্তু দ্যাখোনি বলো? কাল সব দেখাবার ব্যবস্থা করে দেব।

আচ্ছা, এখানে রাত্তিরবেলা গাড়ি নিয়ে কি বেরোনো যায় না?

সে-রকম নিয়ম নেই।

সবাই কি নিয়ম মানে? ধরো, আজ রাত্তিরেই যদি আমি তোমাকে অনুরোধ করি আমাদের চুপিচুপি একটু গাড়িতে করে ঘুরিয়ে আনতে...

নাইরোবি থেকে স্পেশাল পারমিশন না পেলে সে-ব্যবস্থা আমি করতে পারব না। কোনওরকম বিপদ হলে তার দায়িত্ব কে নেবে? গাড়ি নিতে গেলে নদী পার হতে হবে। নদী পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ই অনেক রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে। সাপের কামড় খেতে পারো যখন- তখন।

আগে এই হোটেলের অন্য মালিক ছিল। মানে, সেই মালিক এখনও আছে। কিন্তু দুমাস পরে অন্য দুজন মালিক হবে। এই নতুন মালিকদের তোমার পছন্দ?

নতুন মালিকদের মধ্যে একজন আমার আত্মীয়। অশোক দেশাইকেও আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আগে আমি অন্য একটা হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলাম। ওরা ম্যানেজমেন্ট নেবার পরই আমি ম্যানেজার হয়েছি।

ও, তুমি তা হলে নতুন মালিকদের নিজেদের লোক। সেটা জানতুম না। তা হলে তুমি এই হোটেলের উন্নতির জন্য বেশি চেষ্টা করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। নতুন মালিকরা ভাগ্যবান, তোমার মতন একজন উৎসাহী, কর্মঠ যুবককে পেয়েছে।

ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার দৃঢ় ধারণা, এই হোটেল আবার খুব ভাল চলবে। আমি তা হলে এখন যাই, তোমরা বিশ্রাম নাও। শুভরাত্রি!

ম্যানেজারটির জুতোয় মশামশ শব্দ হয়। সে বেরিয়ে যাবার পরেও খানিকক্ষণ সেই শব্দ শোনা গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, লোকটাকে দেখে তোর কেমন লাগল রে সন্তু?

বেশ ভালই। তবে কথা বলবার সময় কী যেন লুকোবার চেষ্টা করছিল মনে হল।

তুই ঠিক ধরেছিস তো। গভীর জলের মাছ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে কাকাবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, তুই এক কাজ কর, হ্যাজাকটা নে! আমাদের এক্ষুণি বাইরে যেতে হবে।

সন্তু চমকে উঠে বলল, বাইরে যাব? সবাই যে বারণ করল রাত্তিরে বাইরে যেতে।

যা বলছি শোন। দেরি করা ঠিক হবে না। চল চল!

সন্তু কাকাবাবুর অবাধ্য হতে সাহস করল না। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ছমছম করছে। তাঁবুর বাইরে উঁকি মেরে সে শিউরে উঠল, একটু দূরেই দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কাকাবাবু সেদিকে টর্চ ফেলে বললেন, ওটা তো একটা জেব্রা। ভয়ের কিছু নেই। আয় আমার সঙ্গে।

সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে চললেন। খানিক দূরে আর-একটা তাঁবুর সামনে এসে বললেন, দিনের বেলা লক্ষ করেছি, এটা খালি আছে। চটপট ঢুকে পড়, ভেতরে ঢুকে পড়।

এখানে তালা দেবার কোনও ব্যাপার নেই। জিপারটা ধরে টানতেই তাঁবুর দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে বিছানা-টিছানা সবই পাতা আছে।

কাকাবাবু ভেতরে এসে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো তাঁবুটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আলোটা খাটের নীচে রেখে দে। শুয়ে পড়। আজকের রাতটা আমরা এই তাঁবুতেই কটাব। বনের হিংস্র প্রাণীর চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশি রে!

৬. সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে ভাল করে আলাপ হল লিটল ভাইসরয় হোটেলের মালিক পিয়ের লাফর্গের সঙ্গে। বৃদ্ধটি আজও প্রথম দিকে গোমড়া-মুখো ছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু তাঁর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টায় অনবরত হোটেলটার প্রশংসা করে যেতে লাগলেন। একসময় বৃদ্ধটি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, ওহে। ইন্ডিয়ান, এখন আর এই হোটেলটা কী দেখছ! আগে যদি দেখতে, তখন বুঝতে এই হোটেলটা কত ভাল ছিল! আমি নিজেই হোটেলটার সর্বনাশ করেছি।

সকালবেলা চারদিক এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, কোথাও ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। রোদ্দুর খুব নরম, সামনের জলাভূমিতে এখন কয়েকটা হরিণ ছাড়া অন্য

কোনও প্রাণী নেই। অনেক রকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটা পাখি কাছের কোনও গাছ থেকে খুব জোরে জোরে পিরুরুং পিরুরুং শব্দে ডাকছে, কিন্তু পাখিটা দেখা যাচ্ছে না।

সন্তুরা বসেছে খোলা জায়গায় টেবিল-চেয়ারে। বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব।

কাল রাতে জন্তু-জানোয়ারদের হাঁটা-চলা ও নিশ্বাসের শব্দ শুনে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলেও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্তু। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেশ রোদ উঠে গেছে।

চোখ মেলেই সে পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, কাকাবাবু সেখানে নেই। তার বুকটা ধক করে উঠেছিল। তক্ষুনি ছুটে বাইরে এসে সে দেখতে পেয়েছিল, খানিক দূরে, তাদের আগেকার তাঁবুর সামনে, বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে এসে কাকাবাবু শান্তভাবে বসে আছেন।

সন্তু কাছে যেতেই কাকাবাবু বলেছিলেন, আমার সন্দেহটা খুব একটা মিথ্যে হয়নি রে, সন্তু। কাল রাত্তিরে আমাদের এই তাঁবুতে কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন। কাল এক সময়ে বেশ জোর দু পশিলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তুই টের পাসনি। সেই বৃষ্টির জন্যই অতিথিরা তাঁবুর মধ্যে তাঁদের পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। যা, দেখে আয়?

সন্তু সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখল দুটি বিছানাই লণ্ডভণ্ড। কারা যেন বালিশ, তোশক উলটেপালটে কী খোঁজাখুঁজি করেছে। মেঝেতে দড়ির কার্পেটে দু-তিন রকম জুতোর ছাপ। কাকাবাবুর সুটকেসটা হাট করে খোলা।

সন্তু আবার বেরিয়ে আসতেই কাকাবাবু বললেন, দেখলি তো! তা হলে কাল তাঁবু বদলে ঠিকই করেছিলাম, বল? যাক, এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

ব্রেকফার্স্ট খেতে এসে প্রথমেই ম্যানেজার ফিলিপের সঙ্গে দেখা। সে বলেছিল, গুড মর্নিং স্যার। কাল ঘুমটুম কি হয়েছিল একটুও? নিশ্চয়ই সারা রাত জেগে ছিলেন?

কাকাবাবু বলেছিলেন, আরও একটা অসুবিধে হয়েছিল। কী করে যেন তাঁবুর মধ্যে কয়েকটা মাছি ঢুকে পড়েছিল।

ফিলিপ অবাকভাবে বলেছিল, মাছি! রাত্তিরবেলা মাছি?

কাকাবাবু বলেছিলেন, হ্যাঁ, মাছি! আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই সেট্‌সি মাছি। নাম শুনেছি তো আগেই। কিন্তু কী রকম দেখতে ঠিক জানি না। ওগুলো সেট্‌সি মাছি হলে ওদের কামড়ে ঘুম-রোগ ধরত। তাই ভয় পেয়ে আমরা অন্য একটা তাঁবুতে চলে গেলাম। সাঁইত্রিশ নম্বরে। আমাদের মালপত্রগুলো ওখানে সরাবার ব্যবস্থা করে দিও।

ফিলিপ বলেছিল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরা তাঁবু বদলে খবু ভাল করেছ। যদি সেট্‌সি মাছি এসে থাকে, খুবই বিপদের কথা। কিন্তু এখানে তো ওই মাছি নেই। আচ্ছা, আমি ভাল করে চেক করে দেখছি!

তারপর কাকাবাবু এসে বসেছিলেন পিয়ের লাফর্গের টেবিলে।

পিয়ের লাফার্গ ওই কথা বলার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ লাফার্গ, আপনার হোটেল যখন ভালই চলছিল, তখন আপনি এটা অন্যের হাতে দিলেন কেন?

বৃদ্ধ লাফার্গ বললেন, বলতে পারো, সেটা আমার হঠকারিতা! অনেক বছর ধরে বেশ ভালভাবে হোটেল চালিয়েছি। তারপর ভাবলুম, বুড়ো হয়েছি, এখন আমার ছেলের হাতে হোটেলের ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব। ছেলে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই সে বলল, ওই জঙ্গলে গিয়ে আমি হোটেল চালাব? কক্ষনো না! ছেলে একটা চাকরি নিয়ে চলে গোল আমেরিকা। তাতে আমার রাগ ধরে গেল। আমিও ঠিক করলুম, হোটেল বিক্রি করে দেব!

কাকাবাবু বললেন, আপনার ছেলে যদি না আসতে চায়, তা হলে আর কতদিন আপনি এই হোটেল চালাবেন? বেচে দেওয়াটাই তো ঠিক কাজ হবে।

লাফগ বললেন, আমি বেচে দেবার কথা ঘোষণা করতে না করতেই ওই নিনজানে আর দেশাই নামে দুটো লোক আমার সঙ্গে দেখা করল। তারা হোটেলটি কিনবে, কিন্তু তার আগে তারা ছমাস নিজেরা চালিয়ে দেখবে, হোটেলটা কেমন চলে। তারপর দর ঠিক হবে। আমাকেও সেই প্রস্তাবে রাজি হতে হল।

কোন রাজি হলেন?

আমার আর উপায় ছিল না। ওই নিনজানে লোকটার। এখানকার সরকারের কতব্যক্তিদের সঙ্গে জানাশুনো আছে। আর ওই অশোক দেশাইয়ের ক্ষমতা অনেক। এদের কথা না শুনলে এরা এমন একটা কিছু করবে,যাতে আমি আর এই হোটেল বিক্রি করার কোনও খদেরই পাব না। এমনকী যে-কোনও ছুতোয় আমাকে মেরে ফেলতেও পারে।

মেরে ফেলবো?

সেটা আর এমন আশ্চর্য কী কথা! এখন দেখছি, এরা ইচ্ছে করেই হোটেলটা খারাপভাবে চালাচ্ছে। যাতে টুরিস্ট বেশি না আসে। কাল মাঝরাতে উঠে দেখি কী, কোথাও আগুন জ্বলছে না। আমার আমলে এটা ভাবাই যেত না। এই রকম করলে টুরিস্ট আসবে কেন? ছমাস বাদে। ওই নিনজানে আর দেশাই আমাকে বলবে, তোমার হোটেল ভাল চলে না। অতএব দাম কমাও! হয়তো অর্ধেকও দাম দেবে না।

মিঃ লাফার্গ, তুমিও ব্যবসায়ী, ওরাও ব্যবসায়ী, ব্যবসার ক্ষেত্রে এরকম দরাদরি তো চলেই?

এটা দরদরি নয়, স্রেফ জোচুরি। আমি ওদের ফাঁদে পড়ে গেছি।

কিন্তু দুজন টুরিস্ট এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে-কথাটা তো ঠিক। তাতে এই জায়গাটা সম্পর্কে বদনাম তো রটাবেই।

শোনো, ওহে ভারতীয়, এবারে আমি জার্মানিতে গিয়েছিলুম ওই ব্যাপারেই খোঁজখবর নিতে। যে দুজন টুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারা জাতে জার্মান, তাদের পরিচয় আমি জানতে গিয়েছিলুম। কী জানলুম ভাবতে পারো? ওই লোক দুটো ছিল ভাড়াটে গুণ্ডা, যাদের বলে মার্সিনারি, টাকার বিনিময়ে যে-কোনও দেশে গিয়ে ওরা যুদ্ধ করে, মানুষ খুন করে।

ম্যানেজার যে বলল, ওদের একজন ছিল গায়ক আর একজন অধ্যাপক?

তা হলে এখানে খাতায় নাম লেখার সময় ওরা মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল। আমি ওদের সম্পর্কে ঠিক খবর নিয়েছি। ওদের সঙ্গে সবসময় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকত। সুতরাং, ওরা হঠাৎ জন্তু-জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেবে, তা কি বিশ্বাস করা যায়?

তা হলে ওরা গেল কোথায়? নিজেরাই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে?

এখানে খোলা জায়গায় কোনও মানুষ চব্বিশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।

আচ্ছা, মিঃ নিনজানে আর মিঃ দেশাইয়ের অন্য কী কী ব্যবসা আছে, তা তুমি জানো? আমি যতদূর জানি, ওরা আগে কখনও হোটেল চালায়নি।

পিয়ের লাফর্গ হঠাৎ থেমে গিয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আবার সন্তুকে দেখলেন। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ, কেন? তুমি কে?

কাকাবাবু হেসে বললেন, আমি একজন টুরিস্ট। আমার ভাইপোকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। তোমাকে এসব জিজ্ঞেস করেছি, নিছক কৌতূহলে। তুমি এই হোটেলের মালিক, তুমি অনেক কিছু জানবে।

আমি কাগজে-কলমে এখনও এই হোটেলের মালিক হলেও আমার কথা কেউ শুনছে না। এই হোটেলে যা সব কাণ্ডকারখানা চলছে, তা তোমার না। জানাই ভাল, জানলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে।

আমার বিপদে পড়া অভ্যোস আছে। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কিছু না কিছু ঘটে যায়।

টাকা-পয়সার ক্ষতি যা হবে হোক। কিন্তু আমার এত পরিশ্রমে গড়া হোটেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটাই আমি সহ্য করতে পারছি না।

হোটেলটার যদি এরকম বদনাম হয়, তা হলে ভবিষ্যতেও তো আর লোক

আসতে চাইবে না। যারা এখন এই হোটেলটি চালাচ্ছে, তাদেরও তো এই দিকটা চিন্তা করা উচিত। হোটেলের ম্যানেজারটি তো বেশ কাজের লোক মনে হল।

হ্যাঁ, এই নতুন ম্যানেজারটা কাজের লোক তো বটেই। তবে, হোটেল চালানোর চেয়ে অন্য অনেক ব্যাপারে তার উৎসাহ বেশি! তবে, তোমাকে আবার বলছি, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না।

মাথা থাকলেই মাথা ঘামাতে হয়, এই তো মুশকিল!

তুমি হ্যারি ওটাংগোর নাম শুনেছ? তার ভাগ্যে কী ঘটেছিল জানো?

এবারে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত ওই বুড়ো হোটেল-মালিকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, হ্যারি ওটাংগো...হ্যাঁ, তার কথা আমি জানি। কারিযুকির কথাও আমি জানি। আমি ওইরকমই কিছু সন্দেহ করেছিলাম। তুমি মনে করিয়ে দিলে, সেজন্য ধন্যবান। অনেক ধন্যবাদ!

বৃদ্ধটি বললেন, আমি তোমাকে সাবধান করছি, এখানকার কোনও ব্যাপারে মাথা গলিও না। তুমি বিদেশি, তুমি কিছুই করতে পারবে না। বেড়াতে এসেছি, বেড়াও, ফিরে যাও!

বৃদ্ধ টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। কাকাবাবু এক মনে কফিতে চুমুক দিতে লাগলেন।

পাশের টেবিলে আমেরিকান ছেলেমেয়ে দুটি বসেছে। কাল ওরা খুব হাসিখুশি ছিল, আজ সকালে বেশ গভীর। কেউ কোনও কথা বলছে না। ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে নাকি?

সন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, গুড মর্নিং। কাল রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল?

মেয়েটি বলল, মর্নিং! হ্যাঁ, না, ঠিক ঘুম হয়নি; অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম...তোমরা কাল রাত্তিরে তাঁবুর মধ্যে একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলে?

সন্তু বলল, মিষ্টি গন্ধ? কই, না তো!

আমেরিকান ছেলেটি বলল, গন্ধটা আমিও পেয়েছি। এ-রকম কোনও জন্তু আছে কি না জিজ্ঞেস করতে হবে, যার গা থেকে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। ওই গন্ধটা নাকে আসার পর আমার গা গুলোচ্ছিল, সকালেও বমি-বমি পাচ্ছে।

মেয়েটি বলল, আমার তো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চলো, আজই চলে যাই।

ছেলেটি বলল, দ্যাখো, একটু বাদে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। আজকের দিনটা অন্তত থাকি।

মেয়েটি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তেই ছেলেটও তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। দূরে আর-একটা টেবিলে ম্যানেজার ফিলিপের সঙ্গে গুনার ওলেন গল্প করছেন। সন্তুকে তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সন্তু উঠে গেল ওদের টেবিলে। ম্যানেজার ফিলিপ একটা চেয়ার টেনে বসতে দিল তাকে।

গুনার ওলেন হাসতে হাসতে বললেন, বুড়ো হোটেল-মালিকের সঙ্গে এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল তোমাদের? আমি তো ওই বুড়োটার কাছে ঘেঁষি না। বড় বেশি কথা বলে।

ফিলিপ বলল, উনি লোক ভাল। তবে ইদানীং মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে বোধহয়। হোটেলটা বিক্রি করার ব্যবস্থা করে উনি কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কদিন বাদে আমাদের সরকার এমনিই এটা দখল করে নিত, তখন উনি একটাও পয়সা পেতেন না।

পিয়ের লাফার্গকে সন্তুর বেশ পছন্দ হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে এইসব কথা শুনতে সন্তুর ভাল লাগল না।

সে জিজ্ঞেস করল, আজ সকালে বেড়াতে যাওয়া হবে না?

ফিলিপ বলল, আমাদের গাড়িগুলো এয়ারস্ট্রিপে গেছে, আজকের অতিথিদের আনবার জন্য। ওগুলো ফিরলেই তোমাদের পাঠানো হবে। তোমার কাকাবাবুকে বলো, আজ আমি

নিজে তোমাদের নিয়ে যাব। যা দেখাব, তা আর কেউ দেখাতে পারবে না। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিও!

গুনার ওলেন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ংম্যান, তোমার কাকাবাবু কী করেন? মানে ওঁর পেশা কী?

কাকাবাবু সবাইকে বলেন যে উনি আগে ছিলেন জিওলজিস্ট, পা ভেঙে যাওয়ার জন্য আগে-আগে রিটায়ার করেছেন। সন্তুও সেই কথাটাই বলল।

গুনার ওলেন একবার ফিলিপের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। সন্তুর মনে হল, এরা দুজন এতক্ষণ কাকাবাবু সম্পর্কেই আলোচনা করছিল। একজন খোঁড়া লোক সব ব্যাপারে এত খোঁজখবর নিচ্ছে দেখে লোকের তো কৌতূহল হবেই।

ওদের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফিরে এল সন্তু। সামনের জলাভূমিতে এখন অনেক জন্তু এসে গেছে। কালকে ছিল একদল মোষ, আজ আর একটাও মোষ নেই, তার বদলে রয়েছে অনেকগুলো শুয়োর আর বেবুন।

গাড়ির শব্দে বোঝা গেল, এয়ারস্ট্রিপ থেকে আজকের যাত্রীরা এসে গেছে। সন্তু নদীর দিকের পথটার দিকে চেয়ে রইল। মিনিট দশেক বাদে মাসাইগার্ডরা। পাঁচ-ছজন যাত্রীকে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজনকে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। কোথায় যেন দেখেছে, কোথায় যেন দেখেছে! লোকটি একজন লম্বা-মতন ভারতীয়।

লোকটি নিজে থেকেই এগিয়ে এসে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে হাসি-মুখে বলল, কেমন আছেন, মিঃ রায়চৌধুরী? বলেছিলাম না। আবার দেখা হয়ে যেতে পারে!

তক্ষুনি সন্তুর মনে পড়ে গেল, এই লোকটিই প্লেন থেকে নামবার সময় কাকাবাবুর ব্যাগটা হাতে নিয়েছিল। এর নাম পি. আর. লোহিয়া।

কাকাবাবু হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আবার দেখা হয়ে গেল। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

লোকটি চমকে উঠে বলল, চিঠি? তার মানে? কিসের চিঠি? কাকাবাবু বললেন, আপনি হোটেলে আমার নামে যে এক লাইন চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকটি বলল, আমি আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছি? কই, না তো! সে চিঠিতে আমার নাম ছিল?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না, তা হলে বোধহয় অন্য কেউ পাঠিয়েছে। যাই হোক, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশি হলাম, মিঃ লোহিয়া! আপনি ক্লান্ত আছেন নিশ্চয়ই, যান, এখন বিশ্রাম নিন!

লোহিয়া বললে, আসবার সময় প্লেনটা অনেকবার ডিগবাজি খেয়েছে, ওয়েদার খারাপ ছিল নাইরোবির দিকে। তারপর এখানে এসে আর নামতে পারে না, এক পাল বুনো মোষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল এয়ারস্ট্রিপে।

কাকাবাবু বললেন, কাল ছিল হাতি, আজ মোষ! সিংহ থাকলে নাকি নামাই যায় না!

লোহিয়া একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। তাকে খুব চিন্তিত মনে হল। আবার ফিরে এসে সে জিজ্ঞেস করল, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

কাকাবাবু বললেন, না, না, কোনও অসুবিধে নেই। আমি আর সন্তু দিব্যি আছি। এখানে?

লোহিয়া আবার চলে যেতে গিয়েও পারল না। আবার থমকে দাঁড়িয়ে সে হাতছানি দিয়ে বলল, মিঃ রায়চৌধুরী, অনুগ্রহ করে এখানে একটু শুনবেন?

বোঝা গেল, সে কাকাবাবুকে আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু সন্তুর সামনে বলতে অসুবিধে হচ্ছে।

কাকাবাবু উঠে গেলেন তার কাছে। সন্তু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েও কানখাড়া করে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না।

একটু বাদে কাকাবাবু হাসি মুখে ফিরে এসে শুধু বললেন, হুঁঃ!

পি. আর. লোহিয়া চলে গেল অফিস-ঘরের দিকে। একটু পরে ম্যানেজার ফিলিপ এসে বলল, চলো, এবার তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

কাকাবাবু বললেন, তুমি ব্যস্ত মানুষ। তুমি নিজে যাবে কেন? যে-কোনও একজন ড্রাইভারকে দিয়ে দিলেই তো হয়।

ফিলিপ বলল, তুমি আমাদের স্পেশাল গেস্ট। আমার মালিকরা খবর পাঠিয়েছে যে, তোমাদের যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। আমার হাতে এখন অন্য কাজ নেই, আমি নিজেই তোমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে চলো, যাওয়া যাক।

নদী পর্যন্ত জঙ্গলের পথটা আজ ফাঁকা, একটাও জন্তু-জানোয়ার নেই। দুজন মাসাইগার্ড অবশ্য ওদের পৌঁছে দিয়ে গেল নৌকো পর্যন্ত। নৌকোতে উঠে দেখা গেল, খানিকটা দূরে তিনটে হাতি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে, একটা হাতি শুড়ে করে জল ছেটাচ্ছে চারদিকে।

কাকাবাবু ফিলিপকে বললেন, নৌকোটা একটু থামাও, ওদের ভাল করে দেখি!

ফিলিপ অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ও-রকম আরও অনেক দেখতে পাবে। হাতির কি অভাব! এদিকে হাতি খুব বেড়ে গেছে!

এ-পাশে এসে দেখা গেল, গাড়ির চারপাশে এক পাল জেব্রা, তারা গাড়ির গন্ধ শুকছে। তাদের তাড়াতেও হল না, মানুষ দেখেই তারা ল্যাজ তুলে ছুটে পালাল।

চারখানা গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ির গায়ে চাপড় মেরে ফিলিপ বলল, এইটাই সবচেয়ে ভাল, তোমরা দুজনে সামনের সিটে বোসো, ভাল দেখতে পাবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই ফিলিপ বেশ জোরে চালাতে শুরু করল। পথ ছেড়ে সোজা মাঠের মধ্যে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, মাঝে-মাঝে গর্ত, তাতে ফিলিপের ভূক্ষেপ নেই। তার গাড়িটাও খুব শক্তিশালী, গাঁকি-গাঁকি করে ছুটছে।

প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। ধুধু করছে মাঠ, মনে হয় দিগন্ত পর্যন্ত আর কিছুই নেই। আসলে মাঠটি ঢেউ-খেলানো। একবার একটু উঁচু জায়গাতে উঠতেই দেখা গেল একদিকে পিলপিল করছে জন্তু। কয়েক হাজার তো হবেই। গাড়িটা সেদিকে নিয়ে যেতে বোঝা গেল, সেই জন্তুগুলি অধিকাংশই জেব্রা আর ওয়াইল্ড বিস্ট। তারা মাঝে-মাঝে ঘাস খাচ্ছে আর একটু-একটু করে এগোচ্ছে। সন্তু একসঙ্গে এত গোরু-ছাগলও কোনওদিন দ্যাখেনি।

কাকাবাবু বললেন, সব জন্তুগুলোর মুখই একদিকে. সেটা লক্ষ করেছিস সন্তু?

ফিলিপ বলল, তুমি ঠিক ধরেছ, রায়চৌধুরী। এইসব জন্তুরা আসছে। তানজানিয়ার সারিংগেটি জঙ্গল থেকে। জন্তু-জানোয়াররা তো কোনও দেশের সীমানা মানে না। পাসপোর্টেরও পরোয়া করে না। প্রত্যেক বছর এই সময় এই জন্তুগুলো তানজানিয়া থেকে কেনিয়ায় ঢুকে লেক ভিক্টোরিয়ার দিকে যায়। প্রায় এক হাজার মাইল।

সন্তু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, এক হাজার মাইল? সত্যি?

ফিলিপ বলল, হ্যাঁ সত্যি। যাবার পথে কতগুলো যে মরে তার ঠিক নেই। তবুওরা যাবেই।

কেন যায়?

যায় ঘাসের খোঁজে। যখন যেখানে বৃষ্টি হয়, সেখানে ঘাস ভাল হয়। ওরা সেটা জানে। কত কাল ধরে যে ওরা এই একই পথ ধরে যাচ্ছে তা কে জানে?

ওরা গাড়ি দেখে ভয় পায় না?

গাড়িকেও ওরা একটা জন্তু মনে করে নিশ্চয়ই। অনেক গাড়ি দেখে-দেখে ওরা বুঝে গেছে যে, এই শব্দ-করা জন্তুগুলো ওদের কোনও ক্ষতি করবে না। যেমন ওরা হাতি দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু সিংহ বা লেপার্ড দেখলে দৌড়বে?

ফিলিপ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই সন্তু বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আর একটু দেখব।

ফিলিপ বলল, এরকম আরও কত দেখতে পাবে। এদের সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ। চলো, আগে গণ্ডার খুঁজে দেখা যাক। সিংহ, হাতি এসবও অনেক দেখতে পাবে, কিন্তু গণ্ডার সহজে দেখা যায় না। গণ্ডার খুব কমে এসেছে।

মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড় রয়েছে, সেই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে জঙ্গল। কোনও জঙ্গলই তেমন ঘন নয়। এইরকম একটা জঙ্গলে দেখা গেল গোটা-পাঁচেক জিরাফ ঘুরছে। জিরাফরা বোধহয় গাড়ির মতন জন্তুকে পছন্দ করে না, গাড়ি দেখেই তারা দৌড়তে শুরু করল, লম্বা-লম্বা পা ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

ফিলিপ বলল, ওরা কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পায়নি। জিরাফরা নিরিবিলি থাকতে ভালবাসে। অন্য কোনও জন্তুর সঙ্গে মেশে না। তুমি দেখবে, হরিণ, মোষ, জেব্রা পাশাপাশি ঘুরছে, কিন্তু জিরাফরা এরকম কোনও দলে থাকে না।

একটু দূরে দেখা গেল এক পাল হরিণ। ছোট-বড়, নানারকম। কোনওটার মাথার শিং প্যাঁচানো-প্যাঁচানো, কোনওটার ছাগলের মতন।

কাকাবাবু বললেন, আমরা সবগুলোকেই হরিণ বলি। কিন্তু এদের আলাদা-আলাদা নাম আছে। ওই ছোটগুলো...

কাকাবাবুকে বাধা দিয়ে ফিলিপ বলল, হ্যাঁ, ওই ছোটগুলো বুক বাক, গায়ে সাদা-সাদা দাগ। ওই দিকে দ্যাখো গেজেল, ওরা ভেড়ার থেকে বড় হয় না। ওর চেয়ে বড়গুলো ইমপালা, কী সুন্দর শিং দেখেছ, ওরা লাফাতেও পারে দারুণ জোরে। আর যেগুলোর দেখছি নীলা-নীল রং, ওদের বলে টোপি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফিলিপ বলল, চারদিকে লক্ষ রাখো, এখানে নিশ্চয়ই কোথাও সিংহ দেখা যাবে। সিংহ ওই ইমপালা হরিণ খেতে খুব ভালবাসে। অবশ্য ওদের মারা খুব শক্ত।

ফিলিপ আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল। একটু দূরেই দেখা গেল একটা বড় গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে দুটো লেপার্ড। ঠিক যেন দুটো হলদে-কালো রঙের বড় আকারের বেড়াল।

ওদের দেখেই সন্তু বলে উঠল, কী সুন্দর ফিলিপ বলল, হ্যাঁ, সুন্দর বটে, কিন্তু এরকম হিংস্র প্রাণী খুব কমই আছে। এই লেপার্ডের চামড়ার খুব দাম।

গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে ফিলিপ বলল, দাঁড়াও, এবারে একটা মজা দেখা যাবে। হরিণের পালটা আসুক?

হরিণের পালটা ছিল একটা টিলার ওপারে। একটু পরেই তারা এদিকে চলে এল। সঙ্গে-সঙ্গে লেপার্ড দুটো তাড়া করে গেল তাদের।

ফিলিপও তার গাড়িটা ছোটাল ওদের পেছন-পেছন।

লেপার্ডের তাড়া খেয়ে হরিণগুলো ছুটিল পাঁই-পাঁই করে।

কোনও-কোনওটা তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল। সন্তুর প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল, এই বুঝি কোনও হরিণ ধরা পড়ে যায়!

সে চোখ বুঝতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফিলিপ হো-হো করে হেসে উঠল। কাকাবাবুও হাসলেন। সন্তু দেখল যে, লেপার্ড দুটো দৌড় থামিয়ে এক জায়গায় ধপাস করে শুয়ে পড়ে জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে।

হরিণের পালটাও খানিকটা দূরে থেমে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে লেপার্ড দুটোকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কী হল?

ফিলিপ বলল, এই লেপার্ডগুলো সাঙ্ঘাতিক জোরে দৌড়ীয়, কিন্তু ওদের দাম বেশি নেই, খানিকটা গিয়েই হাফিয়ে যায়। হরিণরা তা জানে। হরিণদের দম বেশি, তাই ওরা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেপার্ড দুটোকে লোভ দেখাচ্ছে।

সন্তু বলল, ঠিক যেন একটা খেলা চলছে।

কাকাবাবু বললেন, আসলে কিন্তু খেলা নয়। একসময় একটা না একটা হরিণ মারা পড়বেই। লেপার্ড দুটো তো আর উপোস করে থাকবে না। কিন্তু সেই দৃশ্য আমরা দেখতে চাই না। চলো, অন্য দিকে যাই।

এরপর হাতির দঙ্গল, উটপাখি, নেকড়ে, হায়না, দু জায়গায় দুটো সিংহ পরিবার, এই সবই দেখা হল, কিন্তু গণ্ডার আর চোখে পড়ে না। অথচ ফিলিপ জেদ ধরেছে, গণ্ডার সে দেখাবেই। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে সে গাড়ি চালাচ্ছে, হোটেল থেকে চলে এসেছে বহু দূরে।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, থাক, আজ আর গণ্ডার খোঁজার দরকার নেই।

ফিলিপ বলল, দেখি না। আর-একটু দেখি। পাওয়া যাবে ঠিকই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এখন পর্যন্ত মাসাইদের গ্রাম তো একটাও দেখলাম না।

ফিলিপ বলল, আমাদের হোটেল থেকে মাইল দু-একের মধ্যেই একটা আছে। ওরা অবশ্য অনেকটা সভ্য হয়ে গেছে। আর অন্য মাসাইরা তো এখনও প্রায় যাযাবর। এক জায়গায় কিছুদিন ঘর বেঁধে থাকে, তারপর আবার অন্য কোথাও চলে যায়।

মাসাইরা তো যোদ্ধার জাত। ওদের সঙ্গে কখনও তোমাদের ঝগড়া-টগড়া হয়নি? ওদের এলাকার মধ্যেই তো তোমরা হোটেল খুলছ।

না, ঝগড়া হবে কেন? আমাদের হোটেলেই তো কয়েকজন মাসাই-ছেলে কাজ করে, দ্যাখোনি?

হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু ওদের সঙ্গে তো কথা বলাই যায় না। ওরা ইংরিজি জানে না একেবারে।

ইংরিজি জানলেও হোটেলের গেস্টদের সঙ্গে ওদের বেশি কথা বলা নিষেধ। তুমি ওদের কাছে কী জানতে চাও?

আগে মাসাইরা ইচ্ছেমতন জন্তু-জানোয়ার মারত। ওদের ছেলেরা একটা সিংহ কিংবা হাতি মারতে না পারলে বিয়ে করতেই পারত না। এখন সরকার থেকে ওদের শিকার করা নিষেধ করে দিয়েছে। সেটা ওরা কতটা মেনে নিয়েছে?

কিচ্ছু মানেনি। ওরা এখনও কত জন্তু-জানোয়ার মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছে!

ওরা মারে, আর সেইসব জন্তু-জানোয়ারের চামড়া কারা বিক্রি করে?

রায়চৌধুরী, তুমি কি এইসব নিয়ে গবেষণা করার জন্যই ইন্ডিয়া থেকে এসেছ নাকি?

না, না, না, নিছক কৌতূহল।

সব ব্যাপারে সকলকে বেশি কৌতূহল দেখাতে নেই, তা জানো না?

ওইটাই তো আমার রোগ। আমার বড় বেশি কৌতূহল।

তুমি আমাদের বুড়ো হোটেল-মালিকের কাছে হ্যারি ওটাংগো বিষয়ে কী বলছিলে?

তুমি তা শুনলে কী করে? আমরা তো খুব আস্তে-আস্তে কথা বলছিলুম।

একজন বেয়ারা তোমাদের কফি দিতে এসেছিল। তোমাদের ধারণা সে ইংরিজি জানে না! সে আমাকে সব বলে দিয়েছে।

তুমি হ্যারি ওটাংগোকে চিনতে? তার নাম উচ্চারণ করা অপরাধ নাকি?

তুমি বিদেশি, আমাদের ব্যাপারে নাক গলানো তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই অপরাধ!

শোনো, ফিলিপ, তোমার দেশের ব্যাপারে আমি একটুও নাক গলাইনি, ততবড় লম্বা নকও আমার নেই। আমি মাথা ঘামিয়েছি। আমার এক বন্ধু সম্পর্কে। হ্যারি ওটাংগো আমার বন্ধু ছিলেন। কোনও বন্ধুর বেলায় স্বদেশি-বিদেশির প্রশ্ন ওঠে না। আমার একটা মাথা যখন আছে, তখন তা আমি মাঝে-মাঝে ঘামাবাই।

তা হলে তোমার মাথাটা যাতে বেশিক্ষণ না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা দরকার।

ফিলিপ ঘচ্ করে ব্রেক কষে পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে সন্তুর কানে ঠেকাল। তারপর হুকুমের সুরে বলল, তোমার পকেটে কী কী আছে বার করো। কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করলে এই ছেলেটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

সন্তু খুব একটা ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আরও দুএকবার হয়েছে। সে কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, আমার পকেটে কোনও অস্ত্র নেই। বিদেশে আসার সময় আমি কোনও অস্ত্র বহন করি না। কেন পাগলামি করছ, ফিলিপ। ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার তো কোনও ক্ষতি করতে চাই না। হ্যারি ওটাংগোকে যে আগে খুন করে তারপর হায়েনাদের

পালের সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তা আমি জানি। কয়েক বছর আগে কারিয়ুকি নামে নেতার ভাগ্যেও ওই ব্যাপার ঘটেছিল, তাই না? কিন্তু এতে তোমার তো কোনও হাত নেই। আমি এখানে এসেছি, যো-জামনি টুরিস্ট দুজন উধাও হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে। যদি সে-রহস্যের সমাধান করতে পারি, তা হলে তোমাদের হোটেলেরই তো উপকার হবে।

আমাদের হোটেলের উপকার করবার জন্য তোমার সাহায্য কে চেয়েছে?

তোমার মালিকরা আমাকে সেইজন্যই পাঠিয়েছে।

আমার মালিকরাই খবর পাঠিয়েছে, তোমরা যাতে মাসাইমারা থেকে আর ফিরে না যাও সেই ব্যবস্থা করতে।

তোমার মালিকরা? মানে দেশাই। আর নিনজানে? ও! সেইজন্যই তুমি কাল রাত্তিরে লোক পাঠিয়েছিলে আমাদের ক্লোরোফর্ম ফিয়ে অজ্ঞান করে বাইরে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিতে? আমরা তাঁবু পালটে ছিলুম বলে আর খুঁজে পায়নি।

আজকের ব্যবস্থাটা অনেক ভাল। একেবারে পাক্কা! নামো, গাড়ি থেকে নামো!

এখানে গাড়ি থেকে নামব? তুমিই তো বলেছিলে এখানে গাড়ি থেকে নামা বিপজ্জনক। তা ছাড়া নিয়ম নেই।

নামো চটপট নামো, ন্যাকামি কোরো না?

এখানে নামব, তুমি বলছি কী ফিলিপ? হোটেলে ফিরে চলো, আমাদের খিদে পেয়েছে।

খাওয়া আর তোমাদের এ-জীবনে জুটবে না। তোমরা এখন কাদের খাদ্য হবে, তাই-ই চিন্তা করো?

সন্তু এক ঝটিকায় মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ফিলিপের হাত চেপে ধরতে গেল। কিন্তু ফিলিপ অত্যন্ত সতর্ক। সে রিভলভারের নলটা কাকাবাবুর দিকে ঘুরিয়ে অন্য হাতে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর গর্জন করে বলল, নামো। আমি ঠিক পাঁচ গুনব। তার মধ্যে না নামলে...এক. দুই. তিন...।

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ফিলিপ তারপর সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলেই দিল নীচে। নিজেও নেমে এসে কাকাবাবুর সারা গা চাপড়ে দেখল, কোথাও কোনও অস্ত্র লুকনো আছে কি না। সে কিছুই পেল না।

এক পা সরে গিয়ে সে বলল, আমি এখনই তোমাদের দুজনকে গুলি করে খতম করে দিতে পারি। কিন্তু শুধু শুধু আমি গুলি খরচ করি না। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে যাব, এখান থেকে হোটেল প্রায় কুড়ি- পঁচিশ মাইল দূরে। সেখানে তোমরা কিছুতেই পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে পারবে না। তার আগেই কোনও জন্তু-জানোয়ারের সামনে পড়ে তোমরা শেষ হয়ে যাবে। আমি ফিরে গিয়ে বলব, তোমরা হিরে খোঁজার লোভে জোর করে এক জায়গায় নেমেছিলে, তারপর...

কাকাবাবু বললেন, জার্মান টুরিস্ট দুজনকেও বুঝি এরকম করেছিলে?

শাট আপ! তোমাদের সঙ্গে আর আমি একটাও কথা বলতে চাই না।

কাকাবাবু এবারে ফিলিপের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, শোনো ফিলিপ, তুমি সন্তুকে চড় মেরেছ। বিনা দোষে ওর গায়ে যে হাত তোলে তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করি না। আমার হাতে শাস্তি সে পাবেই।

ফিলিপ অট্টহাসি করে উঠে বলল, তুমি পাগল হয়ে গেছ দেখছি! তুমি কি ভূত হয়ে আমাকে শাস্তি দিতে চাও নাকি? আজকের দিনটাই তোমার জীবনের শেষ দিন।

আমাকে বাদ দিয়ে তুমি এক ফিরে গেলেই পি. আর. লোহিয়া তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তাকে আমি সব বলে এসেছি।

ফিলিপ মুখ ভেংচিয়ে বলল, একজন ইন্ডিয়ান আমার হোটেলে বসে আমাকে অ্যারেস্ট করবে, এত সাহসী! এখানে আমিই রাজা। আমি ফিরে গিয়েই দেখছি সে কেমন লোক?

ফিলিপ এক পা এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, আমার ক্রাচদুটো অন্তত দিয়ে যাও!

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর মুখ বাড়িয়ে ফিলিপ বলল, লেপার্ড তাড়া করলে তুমি ক্রাচে ভর দিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না?

গাড়িটা খানিকটা চলতে শুরু করে তারপর ওদের গোল করে ঘিরে দুতিনবার চক্কর দিল। যেন ফিলিপ মজা দেখছে। তারপর হুশ করে ছুটে গেল দিগন্তের দিকে। একটুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল একেবারে।

সন্তু হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তবু এখনও যেন সে পুরো ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা সত্যি তাদের ফেলে চলে গেল? আফ্রিকার এই হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ভরা প্রান্তরে? কাকাবাবু ওদের কী ক্ষতি করেছেন? কাকাবাবু শুধু ওটাংগো না কাটেংগো কী যেন একটা নাম বলছিলেন। তাতেই ওরা রেগে রেগে উঠছিল। অশোক দেশাইয়ের কাকার নেমন্তন্নতে তারা এখানে বেড়াতে এসেছে, আর সেই অশোক দেশাই তাদের মেরে ফেলতে বলেছে?

কাকাবাবু সন্তুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বদমাইশটা তোর কানের ওপর অত জোরে মোরল, তোর কানের ক্ষতি হয়নি তো? শুনতে পাচ্ছিস ঠিকঠাক?

সন্তুর একটা কান ভোঁভোঁ করছে, তাতে কিছু আসে যায় না। লোকটা তাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেবার সময় তার হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে, তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু এরপর কী হবে?

সন্তু বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাল। এখানে জঙ্গল প্রায় নেই বলতে গেলে, মাঝে-মাঝে একটা-দুটো বড় গাছ, আর সব দিকে ধুধু করছে মাঠ। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট টিলা। কোথাও কোনও জন্তু-জানোয়ার দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর ঝকঝকি করছে সূর্য।

কাকাবাবু সন্তুর হাত ধরে তুললেন। তারপরই একটু ফিকেভাবে হেসে বললেন, তুই ভয় পেয়ে গেলে নাকি রে, সন্তু? দ্যাখ, এর আগে আমরা কতবার কতরকম বিপদের মধ্যে পড়েছি। সব সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক মানুষকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকায় এসে জন্তু-জানোয়ারের মুখে প্রাণ হারাব? তা হতে পারে না। দ্যাখ না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সন্তু তবু কথা বলছে না দেখে কাকাবাবু তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, এই সন্তু, কী হল রে তোর? ভয় পেয়ে চুপ করে বসে থাকলে তো বাঁচা আরও শক্ত হয়ে যাবে! চল, হাঁটতে শুরু করি।

সন্তুর চোখে জল এসে গেল। যদিও সে ভয় পায়নি, সে ভাবছে। অন্য কথা। তার দুখানা শক্তসমর্থ পা আছে, সে দরকার হলে ছুটতে পারবে। কিন্তু কাকাবাবুর যে ছোটার ক্ষমতাও নেই।

জামার হাতায় চোখ মুছে সে বলল, কাকাবাবু, তোমার ক্রাচ দুটোও নিয়ে গেল, তুমি হাঁটবে কী করে?

হ্যাঁ, দ্যাখ তো, লোকটা শুধু বদমাইশ নয়, তার ওপর আবার কী কৃপণ। অন্তত ক্রাচ দুটো তো দিয়ে যেতে পারত! থাক গে, কী আর করা যাবে। বাচ্চা বয়েসে তুই ককফাইট

খেলিসনি? একটা পা মুড়ে আর-একটা পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে খেলতে হয়! সেই টেকনিকেই আমি হাঁটব।

কাকাবাবুর একটা পায়ে একেবারেই জোর নেই। মাটিতে ভর দিয়ে কোনওমতে দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু হাঁটা অসম্ভব। লাফিয়ে-লাফিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি ডেকে বললেন, সন্তু, আয়, এইভাবেই যেতে হবে।

সন্তু এবারে দৌড়ে এসে বলল, কাকাবাবু, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো।

না রে, তাতে দুজনেই হাফিয়ে যাব। আমি লাফিয়ে-লাফিয়েই যাব, খানিকটা বাদে-বাদে দম নেবার জন্য দাঁড়ালেই হবে। তার আগে আমাদের প্ল্যানটা ঠিক করে নিই। একদিকে খুব ভাগ্য ভাল, এখন মাত্র বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। অনেকক্ষণ দিনের আলো পাওয়া যাবে। অনেকেই বলেছেন, এখানকার জানোয়াররা পারতপক্ষে মানুষকে মারে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব খাদ্য আছে। বড়-বড় জানোয়ার দেখলে আমরা কোনও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। ভয় হচ্ছে সাপ আর বন্য কুকুরের পালকে। দিনের আলোয় সাপের জন্য নজর রাখতে হবে সব সময়। আর বন্য কুকুরের ব্যাপারটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু, আমরা কোন দিকে হাঁটব?

যে-কোনও একদিকে একেবারে সোজা। বেঁকলে চলবে না। এখানে সাতটার সময় সন্ধে হয়। খুব আস্তে হাঁটলেও ঘণ্টা সাতেকে আঠারো-কুড়ি মাইল হাঁটা যায়। আর তার মধ্যে কোথাও না কোথাও মানুষের দেখা পাবই। লিট্ল ভাইসরয় ছাড়াও এখানে কিছু দূরে দূরে ছড়ানো আরও তিন-চারটি হোটেল আছে শুনেছি।

কাকাবাবু এমনভাবে কথা বলছেন, যেন সিংহ, লেপার্ড, হাতি, হায়েনা, সাপ, ওয়াইল্ড ডগাস ভরা এই বিশাল প্রান্তর পার হওয়া এমন কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। যেন এটা একটা মজার অ্যাডভেঞ্চার।

কাকাবাবু, ওটাংগো না কাটেংগা কী যেন একটা লোকের নাম বলছিলে ওই ফিলিপকে, সে কে?

হ্যারি ওটাংগো! তুই নাম শুনিসনি? না, তোর জানার কথা নয়। আট বছর আগে উনি একবার ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন, তখন আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। হ্যারি ওটাংগো আফ্রিকার একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। এক সময় ছিলেন উকিল, তারপর সে পেশা ছেড়ে দিয়ে যেখানেই অন্যায়-অবিচার দেখতেন, সেখানেই ছুটে যেতেন বাধা দিতে। তিনি আবার ছিলেন বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি। আফ্রিকায় এমন অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার এখনও আছে, যা পৃথিবীর আর অন্য কোনও দেশে নেই। কিন্তু এখানকার কিছু-কিছু লোভী ব্যবসায়ী মাংস ও চামড়া বিক্রি করার জন্য সেইসব পশুদের মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছিল। জানিস তো, হাতির দাঁতের অনেক দাম, একটা হাতি মারলে তার দাঁত দুটো বিক্রি করেই অনেক টাকা পাওয়া যায়। সেই লোভে মারা হচ্ছিল হাতি। যদিও এই সব পশু শিকার করা এখন নিষিদ্ধ।

কাটেংগা বুঝি সে-সব থামাতে গিয়েছিলেন?

কাটেংগা নয়, ওটাংগো। তিনি কেনিয়ায় এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন যে, এখানকার কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী আর সরকারি কর্মচারী, দুএকজন মন্ত্রীও আছে, গোপনে গোপনে এই পশু-নিধনের কারবার চালাচ্ছে। ইওরোপ-আমেরিকার কয়েকটি কোম্পানি তাদের কাছ থেকে সেইসব কেনে। ওটাংগো ঘোষণা করলেন, কারা কারা এই বে-আইনি, নৃশংস ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের নাম তিনি প্রকাশ করে দেবেন। পরদিন কী হল জানিস? নাইরোবি শহর থেকে মাত্র তেইশ মাইল দূরে হ্যারি ওটাংগোর ছিন্নভিন্ন শরীরটা পাওয়া গেল। একপাল হায়েনা তাঁর অনেকখানি মাংস খেয়ে নিয়ে গেছে। খবরের কাগজে বেরোল যে, মিঃ ওটাংগো কোনওক্রমে হায়েনার পালের মুখে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, ওঁকে কেউ আগে থেকে খুন করে হায়েনাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

ওঁকে কারা খুন করতে পারে, তা তো বোঝাই যায়।

হ্যাঁ, বোঝা যায় তো বটেই। কিন্তু সেই দলটা এত শক্তিশালী যে, কেউ তাদের নাম প্রকাশ করতে সাহস করে না। সব জায়গাতেই ওরা টাকা খাইয়ে রাখে।

ওই ম্যানেজার ফিলিপটাও তা হলে ওই দলে?

ও একটা চুনোপুটি। আসল চাই হল অশোক দেশাই। আর নিনজানের মতন লোকেরা। অশোক দেশাইয়ের আছে টাকার জোর। আর নিনজানের আছে সরকারি মহলে প্রতিপত্তি। পুলিশও ওদের ধরতে সাহস করবে না। এখন বুঝতে পারছিস তো, ওরা কেন হোটেলটা কিনতে চাইছে?

কেন?

এরকম জায়গায় একটা হোটেল হাতে থাকলে এখান থেকে অনেক জীবজন্তু মেরে পাঠাবার সুবিধে। হোটেলটা ভাল না চললেও অন্যদিকে ওদের লাভ হবে অনেক। বুড়ো সুইস সাহেবটার ওপর চাপ দিয়ে ওরা হোটেলটার দামও কমিয়ে ফেলবে অনেক।

তা হলে নাইরোবি শহরে থাকতে দুপুরে কে আমাদের টেলিফোনে ভয় দেখাল, আর কে-ই বা ওই চিঠিটা পাঠাল।

একটু দাঁড়া, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি রে সন্তু! ওই দ্যাখ...

সামনের দিকে তাকিয়ে সন্তু কেঁপে উঠল।

৭. গণ্ডারটা দাঁড়িয়ে আছে

গণ্ডারটা দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট টিলার ওপরে। তার পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে শুধু আকাশ। গণ্ডারটা এমন স্থির হয়ে রয়েছে, যেন মনে হয় একটা পাথরের মূর্তি।

ম্যানেজার ফিলিপ তাদের গণ্ডার দেখাবার ছল করে এতদূর নিয়ে এসেছিল, এবারে সত্যি-সত্যি সেই গণ্ডার নিজে থেকেই দেখা দিল।

কাকাবাবু সন্তুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দুজনেই বসে পড়েছেন মাটিতে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, এবারে আস্তে-আস্তে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। ওর দিকে চোখ রেখে। গণ্ডার এমনিতে মানুষ মারে না। কিন্তু ও আমাদের দেখতে পেলেই চটে যেতে পারে। মাটিতে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবে না।

সন্তু উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে চিবুক ঠেকিয়ে বলল, কিন্তু ও যদি এদিকেই ছুটে আসে?

কাকাবাবু বললেন, ও যদি আমাদের পিঠের ওপর দিয়ে চলে যায়, তা হলে ট্যাঙ্ক চাপা পড়লে যে অবস্থা হয়, আমাদেরও সেই দশা হবে। আশা করি, ও ভদ্রতা দেখিয়ে অন্য দিকে চলে যাবে। আর যদি সত্যি এদিকে দৌড়ে আসে, তা হলে আমরা দুজনে গড়িয়ে যাব, বুঝলি। তাতে অন্তত একজন বাঁচব।

গণ্ডারটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, এদিকেই তাকিয়ে আছে, কী দেখছে কে জানে! অন্য বড় জন্তুরা একসঙ্গে অন্তত তিন-চারজন থাকে, গণ্ডারটি কিন্তু একলা। বিশাল তার চেহারা। গণ্ডারটি যখন টিলার ওপাশ দিয়ে উঠে এসেছে, তখন এই দিকেই তার যাওয়ার ইচ্ছে।

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হতে সন্তু চকিতে একবার পেছনে তাকাতেই তার বুক হিম হয়ে গেল। তাদের পেছনে, ঠিক পেছনে নয়, ডান দিকে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি হাতি, তিনটি দাঁতাল, তাদের মধ্যে একটি শুড় তুলে ডাকছে।

কাকাবাবু বললেন, শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই রে, সন্তু। একদম চুপ করে থাক, একটুও নড়াচড়া করবি না।

সন্তু একবার ভাবল, সামনে বা পেছনে তাকবে না। অথচ না-তাকিয়ে পারছেও না। গণ্ডারটি যেমন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, তেমনি হাতি তিনটিও আর এগোচ্ছে না, তবে তিজনেই একসঙ্গে শুঁড় দোলাচ্ছে ঘন ঘন।

এক-একটা মিনিট যেন এক-এক ঘণ্টা। কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে? ওরা কি পরস্পরকে তাড়া করবে, মাঝপথে সন্তুদের চিড়েচ্যাপ্টা করে দিয়ে? গণ্ডার আর হাতিদের মধ্যে শত্রুতা থাকে, না বন্ধুত্ব?

একসময় গণ্ডারটি পেছন ফিরে আস্তে আস্তে নেমে গেল টিলার অন্য দিকে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথে; সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল। তার ধারণা, এবারে বাঁচতে হলে হাতিদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে হবে।

কিন্তু হাতিগুলাও পেছন ফিরেছে। তারাও গদাই লস্কর চালে ফিরে যেতে লাগল।

কাকাবাবু উঠে বসে কোটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, এইসব জানোয়াররা কী ভদ্র দেখলি? ওরা একদল অন্যের কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করতে চায় না, আবার কেউ কারও পথও আটকায় না। গণ্ডারটা হাতিদের পথ ছেড়ে দিল, হাতিরাও ভাবল, গণ্ডারটাই থাক, আমরা ফিরে যাই।

সন্তু আচ্ছন্ন গলায় বলল, সত্যি ওরা ফিরে গেল? আমাদের দেখতে পায়নি?।

আরে ওদের কাছে আমরা তো এলেবেলে। আমাদের দেখলেও ওরা গ্রাহ্যই করত না। আমরা কার জন্য বেঁচে গেলাম বল তো? গণ্ডারটার জন্য, না হাতিগুলোর জন্য? বলা শক্ত।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, কিন্তু ভেবে দ্যাখ তো, যারা লুকিয়ে শিকার করে, যাদের বলে পোচার, সেইরকম দুজন যদি এখানে উপস্থিত থাকত আমাদের বদলে, তা হলে কী হত? এরকম নির্জন জায়গায়, গণ্ডারটা, হাতিগুলো, একটাও বাঁচত না। আজকাল লাইট মেশিনগান দিয়ে এইসব বড় বড় জানোয়ার মেরে ফেলাও খুব সোজা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, চল, আবার যাত্রা শুরু করি। ওই যে সামনের বড় গাছটা দেখছিস ওই দিকে যাব। একটা নির্দিষ্ট কিছু দেখে এগোতে হবে, নইলে এত বড় মাঠের মধ্যে দিক হারিয়ে ফেলব।

এক-পা-বাঁধা মোরগের মতন কাকাবাবু লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগলেন। সন্তু দেখল, একটু বাদেই ঘামে কাকাবাবুর পিঠ একেবারে ভিজে গেছে। এরকমভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া দারুণ পরিশ্রমের ব্যাপার। এমনভাবে মানুষ কত দূর যেতে পারে? তবু কাকাবাবুর অদম্য উৎসাহ।

বড় গাছটার কাছে পৌঁছে সন্তু ভাবল এখানে একটু বিশ্রাম নেওয়া হবে, কিন্তু কাকাবাবু সেখানে না থেমে বললেন, চল, হাফিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওই সামনের বাঁশঝাড়টা অবধি যাই, অবশ্য ওটার খুব কাছে যাওয়া ঠিক হবে না, ভেতরে কোনও জন্তু থাকতে পারে।

আর-একটু যাওয়ার পরই সন্তু শুনতে পেল, কাকাবাবু ঠিক হাপরের মতন নিশ্বাস ফেলছেন। সন্তু কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, কাকাবাবু, থামো, থামো! এবার একটু বিশ্রাম নিতেই হবে। আমি আর পারছি না।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বুক ভরে কয়েকবার শ্বাস নিলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, দেড়টা বাজে। তোর খিদে পেয়ে গেছে, না রে? আমরা নটার সময় হেভি ব্রেকফার্স্ট খেয়ে বেরিয়েছি। অন্যদিন এই সময় তেমন খিদে পায় না। কিন্তু আজই বেশি খিদে পাবে। খিদে জিনিসটা খুব পাজি, সুবিধে অসুবিধে গ্রাহ্য করে না।

সন্তুর পেটে দাউদাউ করে খিদের আগুন জ্বললেও সে সে- কথা ভাবছে না। সে ভাবছে, দুঘণ্টা তো কেটে গেল, এখনও জনমানবের সামান্য চিহ্নও নেই। প্রান্তরটির চেহারা আগেও যে-রকম ছিল, এখনও সে-রকম। তবে হোটেল থেকে বেরিয়েই এক ঘণ্টার মধ্যে যত জন্তু-জানোয়ার দেখা গিয়েছিল, এদিকে ওদের সংখ্যা খুবই কম। সেই গণ্ডার ও হাতি তিনটের পর মাঝখানে ওরা শুধু দুটো উটপাখি দেখতে পেয়েছিল। সে-দুটো দেখে কাকাবাবু বলেছিলেন, ইশ, কোনওরকমে যদি ওদের ধরে ওদের পিঠে চাপা যেত! ওরা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছোটে।

এরকম অবস্থার মধ্যেও কাকাবাবুর কথা শুনে হেসে ফেলেছিল সন্তু।

কাকাবাবু আবার বললেন, কিতদিন তো আমরা সকালে খেয়ে বেরোই। রাত্তিরের আগে আর খাওয়াই হয় না। মনে কর, আজকের দিনটাও সে- রকম?

সন্তু বলল, কাকাবাবু, রাত্তিরে আমরা কোথায় খাব?

সন্তুর পিঠে চাপড়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, হবে, হবে, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে থেকেই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চল, বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে আর-একটা কোনও নিশানা ঠিক করি। থামলে চলবে না?

বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি গিয়ে ওদের থামতে হল। এই প্রথম ওরা দেখতে পেল সাপ।

আফ্রিকাতে কোনও কিছুই কম-কম নয়। আমাদের দেশে একসঙ্গে একটা-দুটো সাপ দেখতে পাওয়াই যথেষ্ট, এখানে ওরা বাঁশঝাড়ের বাইরেই দেখতে পেল এগারোটা। ভেতরে আরও কত আছে কে জানে!

কয়েকটা সাপ বাঁশগাছে জড়িয়ে আছে, কয়েকটা কাছাকাছি মাটিতে কিলবিল করছে। সবগুলোরই রং কালো, তবে আকারে খুব বড় নয়। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। মাটিতে অনেক গর্ত।

কাকাবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নাক কুঁচকে বললেন, এই একটা প্রাণীকে দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। সাপও নিরীহ প্রাণী, মানুষকে সহজে কামড়ায় না। জানি, কিন্তু আমি সাপের দিকে তাকাতে পারি না, আমার গা গুলিয়ে ওঠে। আমি রিভলভার দিয়ে দুবার দুটো সাপ গুলি করে মেরেছি। এখন যদি সঙ্গে রিভলভারটা থাকত...

বলতে বলতে থেমে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললেন।

সন্তু অনেকক্ষণ ধরেই রিভলভারটার কথা ভাবছে। কাকাবাবুর সঙ্গে সেটা থাকলে ওই হোটেল-ম্যানেজার ফিলিপ কি এত সহজে তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে কাপুরুষের মতন পালাতে পারত? প্লেনে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ওঠা নিষেধ বলেই কাকাবাবু সেটা সঙ্গে আনেননি।–তা ছাড়া, এবারে তো স্রেফ বেড়াতে আসা।

সন্তুর মনের কথাটাই যেন বুঝতে পেরে কাকাবাবু বললেন, রিভলভারটা সঙ্গে আনিনি, ভালই হয়েছে। আনলে একটা-কিছু রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। ওই যে ফিলিপ, ওর চোখ দেখেই বোঝা যায়, লোকটা সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর। হি ইজ অ্যা কিলার। তুই তো জানিস, সন্তু, আমি রিভলভার তুলে লোকদের ভয় দেখাই, চট করে কাউকে গুলি করতে পারি না। কিন্তু ওই ফিলিপ সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়, আমি ওর দিকে রিভলভার তুললেই ও এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দিত।

কাকাবাবু, ওই ফিলিপের মতন লোককে মায়াদয়া না করে গুলি করাই উচিত।

দ্যাখ না, পরে ওকে শাস্তি দিই। কী রকম!

পরে মানে? ওর সঙ্গে কি আমাদের আর দেখা হবে?

বাঁশঝাড়টাকে পাশ কাটিয়ে ওরা আর-একটা কিছু নিশানা ঠিক করার জন্য থামল। ঠিক সোজাসুজি আর কোনও বড় গাছটাছও চোখে পড়ে না। মেঘের গায়ে জেগে উঠেছে একটা বিশাল পাহাড়। তার চুড়া বরফে ঢাকা।

সন্তু একবার চোখ কাঁচকাল। সে সত্যি-সত্যি ওরকম একটা সুন্দর পাহাড় দেখছে, না। ওটা তার চোখের ভুল?

কাকাবাবু পাহাড়টা আগে দেখতে পাননি। সন্তু ডেকে দেখাতেই তিনি বললেন, বাঃ, এতদূর থেকেও যে দেখা যায়, জানতুম না তো! ওটা কী পাহাড় জানিস? ওই হচ্ছে কিলিমাঞ্জারো। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা আছে, মোজ অব কিলিমাঞ্জারো, পড়িসনি বুঝি? এবারে ফিরে গিয়ে পড়ে নিস!

যদি ফিরতে পারি।

ফিরবি না কেন? আবার ঘাবড়াচ্ছিস। তুই কি ভাবছিস, এই মরুভূমির মতন মাঠে আমরা মরে পড়ে থাকব; তা হতেই পারে না! রাজা রায়চৌধুরী এভাবে মরার জন্য জন্মায়নি। আগে ওই ফিলিপটিকে শাস্তি দিতে হবে, অশোক দেশাই আর নিনজানেকে জেলে ভারতে হবে, তবে তো অন্য কথা!

কাকাবাবু, কাকাবাবু, এটা কী? আমার পায়ে, আমার পায়ে...

সন্তুর চিৎকার শুনে কাকাবাবু কেঁপে উঠলেন।

সন্তু ট্রাউজার্স পরে আছে, তার বাঁ পায়ে পেঁচিয়ে ধরেছে একটা সাপ, তার মুখটা ওপরের দিকে, মাঝে-মাঝে একটা লকলকে জিভ বার করছে।

এই প্রথম ভয় পেয়ে গেলেন কাকাবাবু। তাঁর মুখখানা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সাপটাকে দেখে একবার তিনি ঘেন্নায় দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলেন, বোধহয় এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবলেন, এবারে আর সন্তুকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

একদম নড়বি না, না নড়লে ও কিছু করবে না...

পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে কাকাবাবু ডান হাতে জড়িয়ে নিলেন। তারপর বিদ্যুতের গতিতে সেই হাতটা দিয়ে চেপে ধরলেন সাপটার মাথা। প্রবল শক্তিতে সন্তুর পা থেকে সাপটার প্যাঁচগুলো খুলে, সেটাকে আছড়াতে লাগলেন মাটিতে। চার-পাঁচ বার সেরকম আঘাতেই সাপটা অক্কা পেয়ে গেছে, তবু কাকাবাবু থামছেন না। মেরেই চলেছেন।

সন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। আর কোনও সাপ আছে কি না। এ জায়গাটা শুকনো, গর্ত-টর্তও নেই। বাঁশঝাড়টার পাশ দিয়ে আসবার সময়ই নিশ্চয় এই সাপটা কোনওরকমে সন্তুর পায়ে জড়িয়ে গেছে।

এক সময় মরা সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তোকে কামড়ায়নি তো? প্যান্টটা গুটিয়ে দ্যাখ।

সন্তু বলল, না, কামড়ায়নি, সে-রকম কিছু টের পাইনি।

তবু প্যান্টটা তুলে দ্যাখা। ওটা হাঁটুর ওপরে ওঠেনি, ওই পর্যন্ত কোনও ক্ষত-টত আছে কি না! এগুলো কী সাপ আমি জানি না।

সন্তু প্যাণ্ট গুটিয়ে ভাল করে দেখল। একটুও রক্ত-টক্ত চোখে পড়ল না।

তোর বমি পাচ্ছে না? কিংবা ঘুম পাচ্ছে না, সন্তু?

না।

কাকাবাবু এবারে নিজেই শুয়ে পড়লেন মাটিতে। রুমালটা তিনি ফেলে দিয়েছেন, হাত দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, এবারে আমি সত্যিকারের টায়ার্ড ফিল করছি রে, সন্তু। কেন জানিস? কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনের জোর একেবারে চলে গিয়েছিল। সাপ দেখলে আমার ঘেন্না হয়, ভেবেছিলুম, ওটাকে আমি ধরতে পারব না, তোকে বাঁচাতে

পারব না। একবারের চেষ্টায় ওকে ধরতে না পারলে কোনও উপায় ছিল না, তোকে বা আমাকে ঠিক কামড়ে দিত।

কাকাবাবু চোখ বুজলেন।

সন্তুও ঝিম মেরে বসে বইল। তার বদলে কাকাবাবুর পায়ে যদি সাপটা জড়াত, তা হলে সে কি সাপটার মাথা ওইভাবে চেপে ধরতে পারত?

সন্তুর চোখের পাতা জুড়ে আসছে। এই অবস্থায় কি কারও ঘুম পায়? সাপে কামড়ালে নাকি ঘুম আসে। তা হলে কি সাপের বিষ কোথাও লেগেছে?

একটু পরেই কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, চল, চল, সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেকটা সময় চলে গেল।

কাকাবাবু উঠে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলা শুরু করলেন। এর মধ্যেই তিনি হালকা মেজাজটা ফিরে পেয়েছেন। সন্তুকে বললেন, সব জিনিসেরই কিছু-না-কিছু উপকারিতা আছে। এই যে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছি, এর উপকার কী বল তো? আমার পায়ে কোনও সাপ জড়াতে পারবে না। তুই সাবধানে দেখে দেখে আয়।

সন্তু বলল, এবার আমরা কোন দিকে যাব!

সামনে কোনও বড় গাছ বা ঝোপঝাড়ও দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চুড়া।

কাকাবাবু কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে সেই পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে থেকে বললেন, মোজ অফ কিলিমাঞ্জারো। এই নামটার মধ্যে কী নতুনত্ব আছে জানিস? আছে বিস্ময়। এখান দিয়ে বিষুব রেখা গেছে, অর্থাৎ এই জায়গাটা খুব গরম হবার কথা। অথচ এখানেও পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে। যাক গে, আমাদের ওই পাহাড়ের

ডিরেকশানে যাওয়া ঠিক হবে না। বাঁশঝাড়টাকে ঠিক পেছনে রেখে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

আবার খানিকটা যেতেই দেখা গেল অনেকগুলো হাড়গোড় পড়ে আছে। ঠিক যেন একটা মানুষের কঙ্কাল।

সন্তু কাকাবাবুর হাত চেপে ধরতেই তিনি বললেন, ভয় পেলি নাকি? মানুষ নয়, মোষ-টোষের কঙ্কাল মনে হচ্ছে।

ফিলিপের সঙ্গে গাড়িতে আসার সময়ও এরকম কঙ্কাল কয়েক জায়গায় চোখে পড়েছিল। ফিলিপ বলেছিল, সিংহ তো মোষ বা হরিণ মেরে অর্ধেকটা খেয়ে চলে যায়। বাকি মাংস হায়েনা, শেয়াল, শকুনে খায়। হাড়গুলো পড়ে থাকে। বহু বছর পড়ে থাকে।

কিন্তু চলন্ত গাড়িতে বসে দেখা আর অসহায় অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে চোখে দেখার মধ্যে অনেক তফাত। মনে হয়, যে সিংহ ওই মোষটাকে মেরেছিল, সে কাছাকাছি কোথাও আছে।

কাকাবাবু বললেন, একটা ভাল ব্যাপার এই যে, এদিকে আমরা জেব্রা, হরিণ, মোষ বা ওয়াইল্ড বিস্টের ঝাঁক দেখতে পাইনি। ওরা থাকলেই কাছাকাছি সি নেকড়ে, লেপার্ড, চিতা, হয়েনা। এই সব হিস্রে পশু থাকত। ৬dbহ্

সন্তুর মনে হল, এখন সিংহ-টিংহ কিছু একটা সামনে পড়ে গেলেও কিছুই আসে যায় না। ওরা এই ধূসর প্রান্তর কোনও দিনই পার হতে পারবে না।

সামনে জমিটা উঁচু-নিচু হয়ে গেছে। সোজা যেতে গেলে ওদের এখন খানিকটা উঁচুতে উঠতেই হবে।

কাকাবাবু আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা মোটামুটি দক্ষিণদিকেই যাচ্ছি। যদি তানজানিয়ার সীমান্তে পৌঁছতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই মানুষজনের দেখা পেয়ে যাব।

সন্তু খানিকটা হতাশভাবে বলল, কাকাবাবু, ফিলিপ যে-জায়গাটায় আমাদের ফেলে দিয়ে গেছে, সে নিশ্চয়ই হিসেব করে দেখে নিয়েছে। সে জানে, ওখান থেকে আর কোনও দিনই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব না।

কাকাবাবু মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, আবার তুই ওই সব অলক্ষুনে কথা বলছিস? ফিলিপ কি জানে যে, একটা খোঁড়া লোকও বিনা ক্রাচে দশ মাইল পার হতে পারে এই মাঠের মধ্য দিয়ে? আমরা দশ মাইলের বেশি চলে এসেছি।

লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এমনিতেই কষ্টকর, উঁচুতে ওঠা আরও অনেক বেশি কষ্টের। কাকাবাবু সেই চেষ্টা করতে যেতেই সন্তু বলল, তুমি এখান দিয়ে উঠে না, চলো, আমরা খানিকটা ঘুরে যাই। অন্য কোথাও নিচু জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

না, তাতে সুবিধে হবে না। এইরকম ফাঁকা জায়গায় একটা অন্তত দিক ঠিক না রাখলে আমরা গোলকধাঁধায় পড়ে যাব। একই জায়গায় বার বার ঘুরব। চল, আমি ঠিক পেরে যাব।

কাকাবাবু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রইলেন, যাতে মুখ দিয়ে না নিশ্বাস বেরোয়। জোরে জোরে লাফিয়ে তিনি সন্তুর আগে উঠে এলেন ওপরে। তারপর বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, এইবার আমাদের একটু বেঁকতেই হবে।

মাঠটা যেখানে ঢালু হয়ে গেছে, সেখানটা একটা ঘাসবন। তারপর অনেকটা ফাঁকা জায়গায় উইঢিপির মতন কী সব উঁচু-উঁচু হয়ে আছে। ডান দিকের কোণে ছোট ছোট গাছের একটা জঙ্গল। এক-মানুষ উঁচু গাছ।

কাকাবাবু বললেন, ওই ঘাসবনে ঢোকা ঠিক হবে না। নেকড়ে আর লেপার্ডদের লুকিয়ে থাকার প্রশস্ত জায়গা। ওই উইঢিপিগুলোকেও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ওখানে ইঁদুরের গর্ত থাকলে সাপও থাকবে। তার থেকে বরং ওই জঙ্গলটাই নিরাপদ। গাছগুলো ফাঁকা ফাঁকা আছে, ভেতরটা দেখা যাবে। তা ছাড়া, ছোট গাছ ভেঙে দুটো লাঠি তৈরি করতে হবে। হাতে একটা কিছু অন্তত অস্ত্র থাকলে মনে আরও জোর পাওয়া যাবে, কী বল? তা ছাড়া, একটা লাঠি আমার এই পায়ে জড়িয়ে নিলে আমি আর-একটু ভালভাবে লাফাতে পারব। চল, আমরা ওপর দিয়েই ডান দিকে এগিয়ে যাই, তারপর নীচে নামব।

হঠাৎ কুপকুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। বেশ রোদ ছিল আকাশে, কখন মেঘ এসে গেছে, ওরা খেয়ালও করেনি। এতক্ষণে সন্তু খেয়াল করল যে, তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জামাটামাগুলোও ঘামে ভিজে সপাসপে হয়ে আছে। একেবারে। এই বৃষ্টিস্নান বেশ ভালই লাগল ওদের। সন্তু আকাশের দিকে মুখটা হাঁ করে রইল। এ ছাড়া জল পান করার তো কোনও উপায় নেই।

মাটি এখানে এত শুকনো যে, বৃষ্টি পড়ামাত্র শুকিয়ে যাচ্ছে। হোটেলে থাকতে কে যেন বলেছিল, কয়েক মাস ধরে এখানে খরা চলছে। ঘাসবনটার রংও কেমন যেন হলদেটে হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেই সন্তুর শীত করতে লাগল। রীতিমতন কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে। কাকাবাবু নিজের কোটটা আগেই খুলে নিয়েছিলেন, সন্তুকে বললেন, সোয়েটারটা খুলে ফ্যাল। শীত লাগলেও গায়ে ভিজে সোয়েটার থাকা ঠিক নয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, মিনিট দিশেকের মধ্যেই থেমে গেল বৃষ্টি। আবার রোদ্দুরের ঝিলিক দেখা গেল।

কাকাবাবু বললেন, ঘাসবনটা পার হয়ে এসেছি, এখন কোনাকুনি যেতে পারলে জঙ্গলটায় তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেত। কিন্তু এই উইঢিপিগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? এক কাজ করা যাক।

উঁচু জায়গাটায় কিছু কিছু পাথর ছড়ানো আছে। কাকাবাবু কয়েকটা বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে একটা উইটিপি টিপ করে ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি সন্তুও কয়েকটা পাথর ছুঁড়তে লাগল একই টিপি লক্ষ করে।

গোটাতিনেট পাথর একটা টিপির গায়ে লাগতেই একটা কাণ্ড ঘটল। তলা থেকে মাঝারি সাইজের একটা প্রাণী লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেই ছুটিল প্রাণপণে। কাছাকাছি গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ওই রকম আরও দুতিনটে। এত জোরে তারা ছুটতে লাগল, যেন ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠে বললেন, দাঁতাল শুয়োর। এগুলোকে বলে ওয়ার্ট হগ। এরা গর্তে লুকিয়ে থাকে।

এরা মানুষকে অ্যাটাক করে?

কী জানি! তবে এগুলো তো তেমন বড় নয়। আসল ওয়াইল্ড বোর অনেক পেল্লায় পেল্লায় সাইজের হয়। যাকগে, ওদের কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল।

ওরা যে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেন হঠাৎ থেমে যাওয়া একটা ঢেউয়ের পিঠের মতন। দুদিকটা ঢালু। এখানে সুবিধে হচ্ছে এই যে দুদিকের অনেকখানি দেখা যায়। দুদিকেই কোনও আশার চিহ্ন নেই।

ঢেউয়ের পিঠের ওপর দিয়ে এগোতে এগোতেই ওরা জঙ্গলটার কাছে পৌঁছে গেল। এবারে নামতে হবে। ঢালু জায়গা দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠার চেয়েও নামা অনেক শক্ত। যে-কোনও মুহূর্তে উল্টে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

কাকাবাবু বসে পড়ে দু হাত দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে নামতে লাগলেন। সন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, ওই ম্যানেজার ফিলিপটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত! ওকে যদি এখন হাতের কাছে পাওয়া যেত...

নীচে নেমেই সে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, নাইরোবিতে যারা আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিল, তারা কি জানত যে, এখানে আমাদের এই অবস্থা হবে?

কাকাবাবু বললেন, মনে হয় খানিকটা জানত। এখন ভেবে দাখ, সে আমাদের উপকারই করতে চেয়েছিল। যে গাড়ি চাপা দিতে এসেছিল, আমাদের শুধু ভয় দেখানেই ছিল তার উদ্দেশ্য। ইচ্ছে করলেই সে আমাদের একজনকে অন্তত চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে পারত। ফোন করে সে-ই আমাদের ফিরে যেতে বলেছিল।

তা হলে সে কে? সে কি আমাদের কোনও বন্ধু? অমলন্দা-মঞ্জুবৌদির তো এতখানি জানার কথা নয়। তা ছাড়া গাড়ি চাপা দিতে আসার ব্যাপারটা তো অমলদার হতেই পারে না!

না, অমল নয়। সে নিশ্চয়ই এমন একজন কেউ, যে শত্রুপক্ষের মধ্যে থেকেও আমাদের বন্ধু।

কাকাবাবু, অশোক দেশাই কী করে আমাদের শত্রু হল? আমেদাবাদ থেকে তার কোকা ভুলাভাই দেশাই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন।

ভুলাভাই নিশ্চয়ই তাঁর ভাইপোর আসল ব্যবসাটা জানে না। অশোক দেশাইও আগে বুঝতে পারেনি। আমি হ্যারি ওটাংগোর এতটা খোঁজখবর নেব।

বিকেল হয়ে গেল, এখনও আমরা কোনও মানুষের চিহ্ন দেখলুম না।

আরও ঘন্টা-দেড়েক দিনের আলো থাকবে। চল, জঙ্গলে ঢুকে দুখানা লাঠি তো বানাই আগে।

জঙ্গলের কাছাকাছি এসে শোনা গেল, সেখানে গাছপালার মধ্যে নানারকম শব্দ হচ্ছে, কারা যেন সড়সড় করে গাছের ডাল ভাঙছে। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষ আছে জঙ্গলের মধ্যে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, হাতি! হাতির পাল ঢুকেছে! আমাদের ঢোকার আশা নেই। বসে পড়। আর কিছু করার নেই এখন।

একটা পাথরের চাইয়ের আড়ালে ওরা বসার জায়গা করে নিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। চলন্ত হাতির পা। ছোট, বড়, নানারকম। হাতিদের পুরো একটা যৌথ পরিবার। এখানকার গাছগুলোতে সদ্য কাঁচা-কাঁচা সবুজ সবুজ পাতা গজিয়েছে। এই গাছ বোধহয় হাতিদের প্রিয় খাদ্য।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাতির পাল বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। প্রায় পনেরো ষোলোটা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড়, সেটা যেন একটা চলন্ত পাহাড়। এক-একটা কানই যেন দুর্গাপুজোর বিরাট পাখার মতন। দাঁত দুটো যেন দুটো সাদা থাম। আবার, ওই দলে খুব ছোট-ছোট দুধের বাচ্চাও রয়েছে। দেখলে গণেশ-গণেশ মনে হয়। এক-একটা বাচ্চা পিছিয়ে পড়লেই মা-হাতি ঘুরে তাকিয়ে ডাকছে।

পুরো দলটাই আছে বেশ খোশমেজাজে। এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে না। আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুঁড় দোলাতে দোলাতে চলেগেল ঘাসবনের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, যখন বনের মধ্যে আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না, তখন কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল?

হাতির পাল আসায় একটা সুবিধে হল এই যে, তারা অনেক গাছের ডাল ভেঙে রেখে গেছে, সন্তুদের আর সে পরিশ্রম করতে হল না। বরং পছন্দমতন দুখানা ডাল বেছে নিতে পারল।

কাকাবাবু বললেন, এই তো বেশ চমৎকার হল। এবার আমি অনেক সহজে যেতে পারব। চল, তাড়াতাড়ি বনটা পেরিয়ে যাই। অন্ধকার হয়ে গেলে এখানে থাকা ঠিক হবে না।

এই বনে বেবুন ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মাটিতে কয়েকটা বেবুনকে ঘুরতে দেখে সন্তু প্রথমে মানুষ ভেবে চমকে উঠেছিল। আশার ছলনা! তার মনটা দমে গোল আবার। সারাদিনের পরিশ্রমে পা আর চলতে চাইছে না। পেটের মধ্যে খিদেটা ধিকিধিক করে জ্বলছে।

জঙ্গলটা পার হবার পর একটুক্ষণ যেতেই দেখা গেল, একদিকের আকাশ লাল হয়ে গেছে। সূর্য ডুবতে বসেছে। হাতির পাল তাদের অনেকটা সময় খরচ করিয়ে দিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, তাই তো রে, একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে যাবে, আর তো হাঁটা যাবে না। রাত্তিরের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে?

সন্তু চুপ করে রইল। তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ফাঁকা জায়গায় খানিক দূরে ছাতিমগাছের মতন ডালপালা-ছড়ানো একটা গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপাশে আর কিছুই দেখা যায় না!

চল সন্তু, ওই গাছতলায় গিয়ে আমরা বসি। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। তুই তো গাছে উঠতে পারবি? তুই গাছে উঠে বসে থাকবি রাতটা, আমি নীচে বসে পাহারা দেব।

এত দুঃখের মধ্যেও সন্তুর হাসি পেল। সামান্য একটা লাঠি নিয়ে কাকাবাবু কী পাহারা দেবেন?

গাছতলায় পৌঁছেই সন্তু ধপাস করে শুয়ে পড়ল।

কাকাবাবু বসে পড়ে, বিড়বিড় করে বললেন, এমন একটা বাজে জঙ্গল, তাতে কোনও ফলের গাছও নেই। হাতির খাবার হবার জন্যই যেন জঙ্গলটা তৈরি হয়েছে, মানুষের জন্য নয়।

তারপর নিজের ডান পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এতক্ষণ ধরে লাফিয়ে আমার পা-টা ফুলে গেছে। কাল সকালে হাঁটতে মুশকিল হবে।

এরপর দুজনে চুপ করে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। সব কথা ফুরিয়ে গেছে। সমস্ত আকাশটা লালচে হয়ে গেল এর মধ্য, তারপর আস্তে আস্তে কালোর ছোঁয়া লাগতে লাগল। একঝাঁক চিল না বাজপাখি না শকুন কী যেন উড়ছে। ওদের মাথার উপরে। কয়েকটা এসে বসল ছাতিমের মতন গাছটার মগডালে।

এক সময় কাকাবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বল উঠলেন, তা হলে কি ওই ম্যানেজার ফিলিপটাই জিতে যাবে? আমরা হারব? না, তা হতেই পারে না?

সন্তু কান খাড়া করে বলল, কাকাবাবু, কিসের শব্দ? কুকুর ডাকছে?

কোথায়। আমি তো কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি। একবার। ওয়াইল্ড ডগস?

সন্তু তড়াক করে উঠে পড়ে সেই জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, সার বেঁধে আট-দশটি মানুষের মতন কী যেন প্রাণী যাচ্ছে। বুকে বুকে, লাফিয়ে লাফিয়ে। বেবুন নয়, বেবুনের চেয়ে অনেক বড়।

কাকাবাবু, গেরিলা! গেরিলা?

ধ্যাত! কী বলছিস! এখানে আবার গেরিলা আসবে কোথা থেকে? এদেশে গেরিলা নেই। ভয় পেয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

ওই যে, ওই যে!

কাকাবাবু এবারে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দে চিৎকার করে বললেন, মানুষ! মানুষ! ওই তো মানুষ যাচ্ছে। সন্তু, ডাক, ডাক, গলা ফাটিয়ে ডাক?

ঝট করে নিজের জামাটা খুলে তিনি লাইটার জ্বলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর সেই জ্বলন্ত জামা লাঠির ডগায় জড়িয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনিও চ্যাঁচাতে লাগলেন, হেলপ! হেলপ!

মানুষের মতো যে-দলটি নাচতে নাচতে যাচ্ছিল, তারা বোধহয় ওদের ডাক শুনতে পায়নি, কিন্তু আগুন দেখতে পেয়েছে। তারা থমকে দাঁড়াল। তারপর সবাই একসঙ্গে কু-কু-কু ধরনের শব্দ করে ছুটে এল এদিকে।

কাকাবাবু জয়ের আনন্দে হেসে বললেন, আগুন দেখে যারা ছুটে আসে, তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না! সন্তু, উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে রাখ। লাঠি ধরিস না।

তিনি নিজেও আগুন সমেত ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে ওইরকম হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন।

মানুষের মতন দলটি ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ওদের কোনওরকম কথা বলার সুযোগ দিল না। তাদের দুজন সন্তু আর কাকাবাবুকে পিঠে তুলে নিয়ে আবার দৌড়ল।

৮. মাসাইদের পুরো গ্রাম

মাসাইদের পুরো গ্রামটাই গোল করে উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ছোট-ছোট আলাদা কুঁড়ে ঘর। একটি মাত্র ছোট দরজা দিয়ে সেই গ্রামে ঢোকা যায়। লম্বা মাচার ওপরে পালা করে পুরুষেরা পাহারা দেয় সারা রাত। রাতের অন্ধকারে কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের এখানে ঢুকে পড়ার উপায় নেই।

গ্রামের মধ্যে একটা বড় চালাঘরে রয়েছে অনেকগুলো গোরু আর মোষ আর ভেড়া। পশুপালনই এখন এদের জীবিকা। প্রত্যেকটি মাসাই-পুরুষই ছফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীর যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া, হাতে সবসময় থাকে বশা। মাসাই মেয়েরাও কম লম্বা নয়, তারাও যুদ্ধ করতে জানে। মাসাইরা আফ্রিকার অন্য সব জাতের তুলনায় আলাদা।

এক দল মাসাইপুরুষ সন্ধেবেলা গ্রামে ফিরছিল। আস্তে-আস্তে দৌড়বার সময় ওরা মাথা নিচু করে নাচের ভঙ্গিতে এগোয় আর গলা দিয়ে নানারকম পশু-পাখির ডাকের অনুকরণ করে। সন্তু আর কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে ওরা তাদের কাঁধে করে তুলে এনে গ্রামের ঠিক মাঝখানে ফেলল, দুজনে ওদের বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে বর্শা তুলে রাখল। কয়েকজন গেল সর্দারকে ডাকতে।

সেখানেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা পাথর-ঘেরা জায়গায়। সেই আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসে আছে গ্রামের সব নারী-পুরুষ। একটা ভেড়া ঝলসানো হচ্ছে আগুনে।

সর্দার এসে বসল। একটা কাঠের গুড়িতে, ঠিক রাজাদের মতন একটা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে, একটু বুকে। তার বয়স খুব বেশি নয়, বড়জোর বছর চল্লিশ। নাকটা বেশ টিকোলো, গায়ের রং কালো হলেও খসখসে ধরনের নয়, চকচকে, তার মাথার চুল নানা রঙের পুতির মালা দিয়ে বাঁধা, তার গলাতেও অনেকগুলো পাথরের মালা।

সন্তু আর কাকাবাবুর দিকে এক পলক মাত্র দেখল সে, মনোযোগ দিল না। যে-লোকগুলো ওদের নিয়ে এসেছে, তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে সর্দার কী যেন চাইল। সেই লোকগুলো সবাই একসঙ্গে কী যেন উত্তর দিল।

সর্দার আবার কী জিজ্ঞেস করল, লোকগুলো উত্তর দিল একই রকম। এইভাবে কয়েক মিনিট উত্তর-প্রত্যুত্তর চলল। তারপর সর্দার যেন খুব অবাক হল। কাঠের গুড়ির আসন থেকে উঠে এসে সে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টি।

কাকাবাবু ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইংরেজি বোঝে? তা হলে আমাকে উঠে বসতে দাও। আমি সব কথা খুলে বলছি।

সর্দার কাকাবাবুর কথা একবর্ণও বুঝল না। সে এবার কী যেন জিজ্ঞেস করল নিজের ভাষায়, কাকাবাবুও তা বুঝলেন না একটুও।

যে লোক দুটি সন্তু ও কাকাবাবুর বুকের ওপর পা চেপে রেখেছিল, সদারের হুকুমে সরে গেল তারা। তারপর সর্দার হাততালি দিয়ে অন্যদের কী যেন একটা হুকুম করল।

কাকাবাবুর মাথার কাছে যদিও এখনও একজন বর্শা তুলে আছে, তবু সেটা অগ্রাহ্য করে কাকাবাবু বললেন, ওয়াটার। জল না খেলে আমরা মরে যাব। একটু জল দাও!

হাতের ইঙ্গিতে তিনি জল খাওয়া বোঝালেন।

সর্দার দুদিকে হাত নেড়ে বোঝাল, না, এখন জল দেওয়া হবে না। কাকাবাবু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ একটুও ইংরেজি জানো না?

দুজন লোক হাত ধরে-ধরে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে এল সেখানে। বৃদ্ধটির গায়ে একটা টকটকে লাল রঙের চাদর। মাথার চুল বেশ পাকা। চোখ দুটি দেখলে মনে হয়, লোকটি খুব অসুস্থ। কিন্তু তার মুখে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

সেই বৃদ্ধটি কাকাবাবুর পাশে এসে বসতেই সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। সদার হাত তুলে অন্যদের থামিয়ে নিজে কিছু বলল।

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টি। প্রায় দু-তিন মিনিট। তারপর আস্তে আস্তে, পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, এরা জানতে চাইছে, তোমাদের সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ইংরেজি জানো! হে মাননীয় বৃদ্ধ, আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। বন্দুক-পিস্তল তো দূরের কথা, সামান্য একটা ছুরিও ছিল না।

বৃদ্ধ বলল, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে এই একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে, আর বাকি লোকজনরা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, আমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না। আমরা দুজন এই মাঠে-জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমাদের লোকজন ঠিক সময়ে না গিয়ে পড়লে আমরা মরেই যেতম।

বৃদ্ধ বলল, আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না। তোমরা, সভ্য লোকরা, নানারকম মিথ্যে কথা বলতে পারো।

কাকাবাবু বললেন, মাননীয় বৃদ্ধ, দয়া করে একটু জল দিতে বলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল না পেলে কোনও কথা বলতে পারছি না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমরা তোমাদের শত্রু নই, বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছি।

বৃদ্ধ অন্যদিকে ফিরে বলল আগুনটা বাড়িয়ে দিতে। দু-তিনজন লোক আধপোড়া কাঠগুলো ঠেলে দিতে আগুনটা আবার জোর হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বুকে পড়ে কাকাবাবুর মুখের একেবারে কাছে নিজের মুখটা নিয়ে এল, চোখের একটাও পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। চাদরের তলা থেকে একটা হাত বার করে জ্বর দেখার মতন কাকাবাবুর কপালে হাত রাখল, তোমাদের শাস্তি হল মৃত্যু!

কাকাবাবুও চোখের পলক না ফেলে বললেন, মাসাইরা বীরের জাতি বলে খ্যাতি শুনেছিলাম। আমাদের মতন দুজন নিরস্ত্র মানুষকে মেরে যদি তোমাদের খ্যাতি আরও বাড়ে, তা হলে মারো! তোমার লোকজন প্রথমে আমাদের দেখতে পায়নি আমরাই আগুন জ্বালিয়ে ওদের ডেকেছি। কেউ আশ্রয় চাইলেও বুঝি তোমরা তাদের মেরে ফ্যালো?

বৃদ্ধটি খুব জোরে হেসে উঠল। তারপর পাশের একজন লোককে কী যেন একটা হুকুম করল। সদরের দিকে ফিরে অনেক কিছু বলল। সর্দারের মুখেও হাসি দেখা দিল এবার।

বৃদ্ধটি আবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, শোনো হে অতিথি, মাসাই কখনও নরহত্যা করে না। মাসাই কখনও নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। মাসাই কখনও আশ্রিতকে অবিশ্বাস করে না। মাসাই কখনও কারও কাছে জলপান করতে চেয়ে তারপর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কিন্তু তোমরা যারা লেখাপড়া শেখো, যারা সভ্যতার বড়াই করো, তারা এর প্রত্যেকটা জিনিস করো! তোমরা যখন-তখন মানুষ মারো, তোমরা নিরস্ত্র লোককেও আক্রমণ করো, কাউকে আশ্রয় দিয়েও তাকে ঠকাও...ঠিক কি না?

কাকাবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, এর অনেকটা সত্যি। কিন্তু সব সভ্য মানুষই সমান নয়! লেখাপড়া শিখলেও অনেকে সৎ থাকতে পারে।

একজন লোক একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে খানিকটা কী যেন তরল পদার্থ নিয়ে এল। সেটার রং লাল। দুধের মতন ঘন।

বৃদ্ধ বলল, এটা খেয়ে নাও আগে, তারপর তোমার সব কথা শুনব।

কাকাবাবু বাটিটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ বলল, তোমরা দুজনেই খাও।

কাকাবাবু তরল পদার্থটিতে একটু চুমুক দিয়েই মুখটা তুলে বললেন, আমরা শুধু একটু জল চেয়েছিলাম।

বৃদ্ধটি হুকুমের সুরে বলল, আগে ওটা খেয়ে নাও এক চুমুকে। তাতে শরীরে জোর পাবে।

কাকাবাবু সন্তুকে ফিসফিস করে বললেন, এরা দুধের মধ্যে কোনও না কোনও পশুর রক্ত মিশিয়ে খায়। তোর একটু খেতে খারাপ লাগলেও এক চুমুকে যতটা পারিস খেয়ে নে, নইলে এরা অপমানিত বোধ করবে।

সন্তু বিশেষ আপত্তি করল না। তেষ্টায় তার গলা ফেটে যাচ্ছে যেন। চোঁচো করে সে অনেকখানি রক্ত-মেশানো দুধ খেয়ে ফেলল। কাকাবাবু বাকিটা শেষ করে দিয়ে বললেন, এবারে কি আমরা খানিকটা জল পেতে পারি?

বৃদ্ধটি বলল, পাবে। তার আগে তোমার কাহিনীটা শুনি। তোমরা কে? কোথা থেকে এসেছ? তোমাদের মতন দুজন সভ্য মানুষকে এ-রকম নিরস্ত্র অবস্থায় এই দিকে কোনওদিন ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়নি, তাই আমাদের লোকজন খুব অবাক হয়েছে।

কাকাবাবু সংক্ষেপে তাঁদের ঘটনোটা বললেন।

বৃদ্ধটি আবার পেছন ফিরে ওদের ভাষায় সবাইকে সেই কাহিনী শোনাল। সবাই দারুণ কৌতূহল নিয়ে শুনল। তারপর সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে কী একটা হুকুম করতেই দুজন লোক এসে কাকাবাবুর দুহাত চেপে ধরে দাঁড় করাল। সদার এগিয়ে এসে কাকাবাবুর খোঁড়া পাটা তুলে হাত ঝুলিয়ে দেখল।

তারপর সর্দার প্রথমে অন্যদের দিকে ফিরে একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে কী একটা দুবোধ চিৎকার করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে আবার ফিরে নিজের কপালটা ঠুকে দিল কাকাবাবুর কপালে।

এর পর যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দুজন নিয়ে এল দুবাটি জল। দুটি মেয়ে দিল দুবাটি ছাতুর মতন খাবার। একজন ঝলসানো ভেড়ার মাংস থেকে অনেকটা কেটে এনে রাখল। কাকাবাবুর পায়ের কাছে। একজন কাকাবাবুর গলায় পরিয়ে দিল একটা পাথরের মালা।

বৃদ্ধটি হেসে বলল, তুমি খোঁড়া পায়ে এত বিপদের মধ্যেও এতখানি পথ পার হয়ে এসেছ শুনে এরা তোমাকে বীর হিসেবে স্বীকার করছে। মাসাইরা বীরের সম্মান দিতে জানে।

কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, আমাকে এরকম সম্মান আগে কখনও কেউ জানায়নি। আজ আমি ধন্য হয়ে গেছি। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি।

সর্দার বৃদ্ধকে আবার কিছু একটা কথা মনে করিয়ে দিতেই বৃদ্ধটি কাকাবাবুকে বলল, তোমরা আগে একটু খাবার খেয়ে নাও, তারপর তোমাদের কয়েকটা জিনিস দেখাব?

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, একটু একটু খেয়ে নে। আজ সারাদিন যা ধকল গেছে, হঠাৎ বেশি খাবার খেলে বমি এসে যাবে।

সন্তু বলল, আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। ওই দুধ খেয়েই খিদে চলে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, তবু একটু করে সবই মুখে দে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আমরা এখান থেকে ফিরব কী করে? এ জায়গাটা কোথায়? আমাদের হোটেল থেকে কতদূর?

দাঁড়া, সব জানা যাবে। আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। সন্তুর কথা সে এক বিন্দু বুঝতে না পারলেও বোধহয় আন্দাজ করে নিল, সন্তু কী বলতে চায়। খানিকটা মজা করবার জন্যই যেন সে এবার সন্তুকে

বলল, তোমরা যখন আমাদের মধ্যে এসে পড়েছই, এখন এখানেই থেকে যেতে হবে। সারাজীবন। থাকতে পারবে না? আমাদের খাবার তোমার পছন্দ হয়নি?

সন্তু বলল, হ্যাঁ, এখানে থাকতে আমাদের ভালই লাগবে। কিন্তু তার আগে হোটেলের ম্যানেজার ফিলিপকে শাস্তি দিতে চাই। সেইজন্য একবার অন্তত ফিরে যেতে হবে।

বৃদ্ধটি বলল, বাঃ, তোমারও তো বেশ তেজ আছে দেখছি। তা তুমি ওই ম্যানেজারকে কী শাস্তি দেবে ঠিক করে রেখেছ?

ওর ফাঁসি হওয়া উচিত!

ফাঁসির চেয়েও ভাল শাস্তি আছে। ধরো, যদি ওকে দিয়ে একেবারে সারাজীবন গোরুর গোবর পরিষ্কার করার কাজে লাগানো যায়, তা হলে কেমন হয়। আমরা হলে তাই করতাম!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আপনি কোথায় কী দেখাবেন বলছিলেন?

বৃদ্ধটিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি নিজে হাঁটতে পারি না, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হয়। আমি খুব অসুস্থ, বেশিদিন বাঁচব না। এই দেখুন!

বৃদ্ধটি গা থেকে লাল রঙের কাপড়টা খুলতেই দেখা গেল, তার বুকের ডান দিকে একটা মস্ত বড় ঘা। দগদগ করছে।

আবার কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে দুদিকে দুহাত ছড়াতেই দুজন লোক তাকে ধরে-ধরে নিয়ে চলল। আর একজন সঙ্গে নিয়ে চলল। একটা মশাল।

প্রথমে ঢোকা হল একটা কুঁড়েঘরে। মশালের আলোয় দেখা গেল, সেখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় হাতির দাঁত ও অনেক রকম জন্তুর চামড়া পড়ে আছে। আর-এক পাশে রয়েছে তিনটে রাইফেল, দুটো রিভলভার ও দুটো লাইট মেশিনগান। কয়েকটা বেল্ট ভর্তি টোটা।

বৃদ্ধ বলল, এইসব জন্তুগুলো আমরা মারিনি। মেরেছে। শহরের লোকেরা। আমরা আজকাল পশুপালন করি, পশুহত্যা করি না। তবু আমাদের নামে দোষ পড়ে। সরকারের লোক আমাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়। যে-সব অস্ত্র দিয়ে ওদের মারা হয়েছে সেগুলোও দ্যাখো।

কাকাবাবু অবাকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা ওই অস্ত্রগুলো পেলেন

কোথা থেকে?

সভ্য লোকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমরা ব্যবহার করি না। তা বলে ভেবো না যে, আমরা ব্যবহার করতে জানি না। আমি নিজে মাউমাউ

বৃদ্ধ একটা এল. এম. জি. তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরল, ট্রিগার টিপল, গুলি ভরা নেই, তাই শুধু খট্-খট্ শব্দ হল কয়েকবার। বৃদ্ধ সেটি অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবার!

এরপর আসা হল বড় চালাঘরটিতে। সেটি আসলে একটি বৃহৎ গোয়ালঘর। সেখানে রয়েছে গোটা-পঞ্চাশেক গোরু, শখানেক ভেড়া ও গোটা-চারেক জেব্রা।

বৃদ্ধ বলল, এইসব পশু আমাদের নিজস্ব। এগুলোর ওপর নির্ভর করেই আমরা বেঁচে আছি। এক জায়গার ঘাস ফুরিয়ে গেলে আমরা সেখান থেকে গ্রাম তুলে নিয়ে আবার যেখানে ঘাস আছে সেখানে চলে যাই।

গোরুগুলোর স্বাস্থ্য চমৎকার। আমাদের হরিয়ানার গোরুকেও হার মানায়।

এইসব গোরুরই দুধ আর রক্ত একসঙ্গে আমরা খাই। তাতে গায়ে জোর হয়। এসো হে বিদেশি, তোমাদের আর দুটি বিচিত্র পশু দেখাই!

গোয়ালঘরের খানিকটা ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় মশালের আলো ফেলতেই কাকাবাবু আর সন্তু দারুণ চমকে উঠল। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, এ কী!

দুটো খুঁটির সঙ্গে হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা দুজন মানুষ। তাদের পরনে শুধু নেংটি, খালি গা, সম্পূর্ণ কাদামাটি মাখা, চুল জট-পাকানো, তবু বোঝা যায় ওরা দুজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব।

সন্তু অস্ফুট স্বরে বলল, সেই দুজন জার্মান টুরিস্ট!

কাকাবাবু বললেন, টুরিস্ট নয়, মার্সিনারি। ভাড়াটে সৈনিক। টাকার বিনিময়ে মানুষ মারত।

বৃদ্ধ বলল, এদের দুজনকে তোমাদের ওই লিট্‌ল ভাইসরয় হোটেল থেকে ভাড়া করা হয়েছিল গোপনে এখানে জন্তু-জানোয়ার মারার জন্য। এল. এম. জি. দিয়ে হাতি-গণ্ডার-হরিণ-লেপার্ড কিছুই মারতে বাকি রাখত না। দাঁত, শিং, চামড়ার জন্য। দোষ হত আমাদের। সেইজন্যই ওদের এখানে ধরে রেখেছি।

বুলি এদের খোঁজ পানি পুলিশ তো এদের অনেক খোঁজাখুঁজ করেছে।

না। কোনও পুলিশ বা সরকারি লোক, গত ছমাসের মধ্যে আমাদের এখানে আসেনি। আমরা ওদের দিয়ে এই গোয়ালঘর পরিষ্কার করাই রোজ। এর মধ্যে তিনবার ওরা পালাবার চেষ্টা করেছিল, তিনবারই ধরা পড়েছে। আমাদের জোয়ান ছেলেদের চোখ এড়ানো খুব শক্ত!

একটু থেমে, একটু হেসে বৃদ্ধ আবার বলল, সাহেব জাতি আমাদের এখান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বানিয়েছে। তাই না? এখন আমরা যদি দুচারটে সাহেবকে ক্রীতদাস করে রাখি, সেটা কি অন্যায়, বলো?

না, মোটেই না!

মাসের পর মাস এই জার্মান দুটি বোধহয় সন্ধের পর আলো দ্যাখেনি। মশালের আলো দেখে গোরুগুলো যেমন ছটফট করতে লাগল, সেইরকম। ওই মানুষ দুজনও চোখ পিটপিট করতে লাগল। একজন কাকাবাবুর দিকে কোনওরকমে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, হেলপ! ইউ প্লিজ হেলপ আসি

কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, দুঃখিত, আমি তোমাদের কোনও সাহায্য করতে পারব না। তোমরা এই সহৃদয় বৃদ্ধটির কাছে ক্ষমা চাইতে পারো। দয়া চাইতে পারো।

মাসাই বৃদ্ধটি বলল, তা হলে শোনো! এই দুজন শ্বেতাঙ্গ যখন এখানে বহু পশু হত্যা করছিল, তখন আমি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থামাতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার বড় ছেলে, সে তখন মাসাই দলটির সর্দার। আমরা দুজন এদের সঙ্গে কথা বলতে যেতেই এরা আমাদের ওপর গুলি চালাল। মানুষ বলে আমাদের গ্রাহ্য করল না। ওদের চোখে আফ্রিকার কালো মানুষ আর পশু যেন সমান। আমার বড় ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়, আমি তখন মরিনি, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুলি রয়ে গেছে, সেই ক্ষততেই আমি মরব। তার পরেও দ্যাখো, এদের দুজনকে বন্দী করার পর আমরা সঙ্গে-সঙ্গে খুন করিনি। তারপরেও কি তোমরা বলবে, মাসাইরা নিষ্ঠুর?

বৃদ্ধের কথা শুনে জার্মান দুজন চোখ বুজে পাশ ফিরেছে। কাকাবাবু সেই বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনিই প্রকৃত দয়ালু। এতটা ক্ষমাশীল আমরা কেউ হতে পারতাম না!

সন্তু বলল, আমি কি বাইরে যেতে পারি? আমি আর ওদের দেখতে চাই ক্না!

আপনি জানেন নিশ্চয়ই, নির্বিচারে পশুহত্যা এখনও চলেছে। আপনি দুজন খুনিকে বন্দী করেছেন, ওরা আরও এরকম লোক ভাড়া করবে। এই সব বন্ধ করার জন্য আমাদের একবার ফিরে যাওয়া দরকার।

বৃদ্ধ হেসে বলল, অফ কোর্স। তোমরা কি ভেবেছ, তোমাদের এখানে আটকে রাখব। আমরা! যখন ইচ্ছে যেতে পারো।

কিন্তু আজ সারাদিন এক পায়ে লাফিয়ে আমার হাঁটু ফুলে গেছে।

কাল-পরশুর মধ্যে আমি এই হাঁটুতে আর লাফাতে পারব না। একটা গাড়ি ডাকা দরকার। আচ্ছা, মাসাইমারা এয়ারস্ট্রিপ থেকে এই জায়গাটা কত দূরে?

বেশি দূর নয়।

তবু? কুড়ি মাইল? তিরিশ বা চল্লিশ মাইল?

অত না। তোমরা সারাদিন হাঁটলেও খানিকটা অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরেছ। এখান থেকে মাসাইমারা এয়ারস্ট্রিপ মাত্র দশ মাইল আর লিটল ভাইসরয় হোটেল হবে তেরো মাইল। আমরা অবশ্য ওদিকে কক্ষনো যাই না।

আমি একটা চিঠি লিখে দিলে তোমাদের কোনও মাসাই-ছেলে ওই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে প্লেনের পাইলটের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিতে পারবে না?

কোন পারবে না। এ আর এমন শক্ত কী ব্যাপার। কিন্তু সে-সব কাল ভোরের আগে তো কিছু হবে না। এখন চলো, নাচ দেখবে। আমরা মাসাইরা প্রত্যেক রাত্তিরে খানিকটা নাচ-গান না করে ঘুমোতে যাই না?

এর পর সেই আগুনের জায়গাটা ঘিরে শুরু হল নাচ-গান। কিন্তু সন্তু আর বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারল না। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু আগুনের আলোয়

একটা চিঠি লিখলেন। তারপর একটু বাদে বৃদ্ধের অনুমতি নিয়ে তিনিও শরীর এলিয়ে দিলেন।

পরদিন দুপুরের আগেই একটি গাড়ি নিয়ে হাজির হল তিনজন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন ভারতীয়। মাসাইদের গ্রামের একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে তারা এগিয়ে এল আস্তে আস্তে।

ভারতীয়টি পি. আর. লোহিয়া, শ্বেতাঙ্গটি প্লেনের পাইলট আর কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি ওদের অচেনা।

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটিই আগে এগিয়ে এসে মাসাই সদার এবং বৃদ্ধ লোকটিকে অভিনন্দন জানোল। তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের কোনও অনিষ্ট হয়নি।

লোহিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ইনি মিঃ জোসেফ এনবোয়া। ইনি কেনিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ইনি আজ সকালের প্লেনেই পৌঁছেছেন। হোটেলের ম্যানেজার ফিলিপ যখন কাল তোমাদের বাদ দিয়ে একলা ফিরে এল, তখনই আমি নাইরোবিতে একে ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছি।

জোসেফ এনবোয়া মাসাই-বৃদ্ধটিকে বললেন, তোমার লোকজনকে বলে দাও, মাসাইদের সঙ্গে সরকারের কোনও ঝগড়া নেই। এই অঞ্চলে যে বে-আইনিভাবে বহু পশু হত্যা করা হয়, তার জন্য মাসাইরা দায়ী নয়, কয়েকজন ব্যবসায়ীর দুষ্টচক্র এই কাজ করছে, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রেসিডেন্টের একজন আত্মীয় প্রেসিডেন্টকে কিছু না জানিয়ে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এই কারবার চালাচ্ছিল, তাকে আর তার সঙ্গী-সাথী আরও চারজনকে কাল বন্দী করা হয়েছে। তোমরা মাসাইরা এখানকার ঘাস-জমিতে যেমন পশু চরাতে, এখনও সেই অধিকার পাবে। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।

বৃদ্ধটি মাসাইদের ভাষায় সেই কথাগুলো অনুবাদ করে দিতে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

বৃদ্ধটি এবার জোসেফ এনবোয়া আর পাইলটটিকে নিয়ে গেল গোয়ালঘর দেখাতে।

লোহিয়া কাকাবাবুর হাত ধরে বলল, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিঃ রায়চৌধুরী, প্লেনে আপনাকে দেখতে পাওয়ার পরেই আমি বিবেকের দংশনে ভুগছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম, আপনি কোনও রহস্যের গন্ধ পেলে সহজে ছাড়বেন না। আর আপনি বেশি কিছু জেনে ফেললে এরাও আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে।

কাকাবাবু হাসিমুখে বলেন, আপনিই নাইরোবির হোটেলে টেলিফোনে আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন?

লোহিয়া বলল, প্রথম টেলিফোনটা করেছিল নিনজানে। আমারই অফিসে বসে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্তু, তুই তা হলে ঠিকই ধরেছিলি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আমাদের গাড়িচাপা দিতে এসেছিল কে?

এটাও নিনজানের কীর্তি। ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আপনাদের ভয় দেখাতে। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই গোঁয়ার। অশোক দেশাইয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু লোকটার প্রচণ্ড টাকার লোভ।

হ্যারি ওটাংগো-কে ওরাই খুন করিয়েছে, তাই না?

সেটা আমি মাত্র কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছি। আপনি নাইরোবি শহরে আরও দুচারদিন থাকলে আমি আস্তে-আস্তে আপনাকে সব কিছু জানতাম। কিন্তু আপনি সে সুযোগ দিলেন না। আমি চিঠি লিখে আপনাকে বারণ করলাম, তবু আপনি মাসাইমারায় চলে এলেন।

হোটেল-ম্যানেজার ফিলিপ কাল ফিরে গিয়ে আপনাদের কী বলল

আমাদের সম্পর্কে?

সে এক উদ্ভট গল্প। আপনারা নাকি কোথায় হিরে খুঁজে পেয়েছিলেন। তারপর রিভলভার দেখিয়ে ওকে বাধ্য করেছেন গাড়িটা তানজানিয়ার দিকে নিয়ে যেতে। সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আপনারা পালিয়ে গেছেন! এ-গল্প আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করিনি। আমি তো আপনাকে চিনি।

সে আপনাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেনি? সে বলেছিল, এই এলাকায় সে কারুকে পরোয়া করে না?

সে আমাকে শাসিয়েছিল। সে তখনও জানত না, আমি তার মালিকদের উকিল। আমি প্রথমে এসে পরিচয় দিইনি। তারপর যখন আমার আসল পরিচয় জানল, তখন চুপসে গেল। এ-দেশের লোক উকিলদের খুব ভয় পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, ওই ফিলিপকে ধরা গেল না। আজ ভোরবেলা সে পালিয়েছে।

সন্তু চমকে উঠে বলল, লোকটা পালিয়েছে? কী করে পালাল?

ও তো এদিককার সব জায়গা চেনে। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে কে জানে। আমরা হোটেলটা সিল করে দিয়েছি। আপাতত এক মাস বন্ধ থাকবে। গার্ডদের বলে দেওয়া হয়েছে, ফিলিপকে দেখলেই যেন বন্দী করে।

গোয়ালঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। জার্মান বন্দী দুজনকেও হাত বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। মাসাইরা রাজি হয়েছে জোসেফ এনবোয়ার হাতে ওদের তুলে দিতে। নাইরোবিতে ওদের বিচার হবে।

সন্তু সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলল, জানেন, ম্যানেজার ফিলিপ পালিয়ে গেছে! ওকে শাস্তি দেওয়া গেল না?

বৃদ্ধ শান্তভাবে বলল, শাস্তি ও পাবেই। ও যদি মাসাইমারায় যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকে, মাসাইরা ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে। এক পালিয়ে ও বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। ওকে খিদে শাস্তি দেবে, ওকে রোদ্দুর শাস্তি দেবে, বৃষ্টি শাস্তি দেবে, আকাশ শাস্তি দেবে। যে পশুদের ও মেরে মেরে শেষ করতে চেয়েছিল, সেই পশুরাও ওকে শাস্তি দেবে।

সন্তু বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে শহরে চলুন না। হাসপাতালে চিকিৎসা করলে আপনি সেরে উঠবেন।

বৃদ্ধ সন্তুর কাঁধে হাত রেখে হাসল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, মাসাইরা জানে, কখন তাদের মৃত্যু আসবে। মাসাইরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। আমার বুকের মধ্যে যে গুলিটা ঢুকে বসে আছে, সেটা আসলে সভ্যতার বিষ। আমি জানি, আমি আর বাঁচব না। তোমরা যাও, তোমরা শান্তিতে থেকো।

সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। কান্না লুকোবার জন্য সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।